হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার সুবিধা হইবে। ঈশ্বর উক্ত মহাত্মাদিগের এ মঙ্গলময়ী চেষ্টা সফল করুন।

ধর্ম্মশালা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মুসৌরী সহরে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে সম্ভ্রান্ত ভ্রমণকারীরা যাহাতে বিনা ব্যয়ে থাকিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১লা অক্টোবর, শুক্রবার, লেডী এলগিন্ তাঁহার মোরে সায়ারের (Moray Shire) বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ছয়টী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারদিগকে সান্ত্বনা প্রদান ও তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

নারী-শিল্প—আজকাল শিল্পের আদর দিন দিন বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিল্পশিক্ষারও উপায় হইতেছে। ছাত্রদিগের শিল্পশিক্ষার জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে ছাত্রদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সম্প্রতি মহিলাদিগের জন্যও একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাতে শিল্প সম্বন্ধে নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে শিল্প শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতেছে বটে, কিন্তু নারী-শিল্প-শিক্ষার এখনও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। মহিলারা যদি আপন আপন সাধ্যমত নারীশিল্প সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের গৃহে বসিয়া শিল্পশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। আশা করি, সকলেই এইরূপ শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে সচেষ্ট হইবেন।

ভারতের বিশ্বজনীন সম্মিলন—সুবিজ্ঞ মনীষী আলি ইমাম মহোদয় ১৮ই অক্টোবর লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ান সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—ভারতের উন্নতির জন্য যে স্বদেশী ভাবের প্রয়োজন এবং আমি যাহার পক্ষপাতী, সে স্বদেশী ভাব পরিপুষ্ট হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ভারতবাসীর প্রকৃতির এরূপ উৎকর্ষ চাই যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহে জাতীয় জীবনের একই প্রাণনাড়ী একইভাবে স্পন্দিত হইবে (যেমন এক সুরে বাঁধা অনেকগুলি বীণাতন্ত্রীতে যুগপৎ আঘাত করিলে সে সকল হইতে এককালে একই ধ্বনি উত্থিত হয়)। ভারতের এই মহাসম্মিলনের প্রথম সোপান সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের উন্মূলন। এই বিশ্বজনীন সম্মিলন সিদ্ধির মৌলিক উপাদান এদেশে ব্রিটিশ অধিকারের স্থায়িতা এবং ইংরাজ ও এদেশীয় উভয়ের পরস্পর সদ্ভাব, সহানুভূতি ও সহায়তা। কথাগুলি সত্য। ইংরাজকে শত্রু ভাবিয়া কার্য্য করিলে ভারতবাসীরই সর্ব্বনাশ।

# পারস্য-কবি সেখ সাদি।

বিখ্যাত পারস্য-কবি সেখ সাদির নাম অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ১১৯৪ খৃঃ অব্দে শিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা শাদ্‌বিন জাঙ্গি সমধিক সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। রাজসরকারে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। বাল্যাবস্থাতেই সাদির পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তিনি বোগদাদ নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে ঈশ্বরোপাসনায় ও ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মে। সকলে তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইলে, তিনি "সেখ" উপাধি লাভ করেন। এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকিয়া তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া বহু দেশ পর্য্যটন করেন। আসিয়া মাইনর, বারবারি, আবিসিনিয়া, মিসর, সিরিয়া, পালেষ্টাইন, আরমেনিয়া, আরব, ইরাণ ও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ পরিদর্শন করেন। ভারতবর্ষের গুজরাট প্রদেশের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরও দর্শন করেন। নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমে নানা কারণে স্বজন বান্ধবের প্রতি বীতরাগ হইয়া জারুসালেমের মরুভূমিতে পলায়ন করিয়া বন্য পশুর সহিত কিছুদিন বাস করেন। এই সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে বিষম সমরানল (ধর্ম্মযুদ্ধ) প্রজ্বলিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদের হস্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দিভাবে ত্রিপলি নগরীর পরিখা-খননের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। দৈবযোগে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত কোনও বন্ধু তাঁহাকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, দশটী সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করেন এবং তাঁহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়া নিজ দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভার্য্যা অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। এক দিবস এই রমণী সাদিকে সম্বোধন করিয়া উপহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাকেই না আমার পিতা খৃষ্টানদের হস্ত হইতে দশটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাসত্ব হইতে মোচন করেন?" তদুত্তরে সাদি বলেন,—"হাঁ! আমাকে দশ মুদ্রায় মুক্ত করিয়া শত মুদ্রায় তোমার ক্রীতদাস করেন। প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় সাদি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটীমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্যাটীও শৈশবাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। সাদীর ভাগ্যে গার্হস্থ্য সুখ ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের অধিক দিন কষ্টে গিয়াছিল, এমন কি, ষাট সত্তর বৎসর তিনি নির্জ্জন বনে ও গুহায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু এ কষ্ট তাঁহার কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পাদুকা ক্রয় করিবার অর্থ না থাকাতে তাঁহাকে নগ-

পদে বেড়াইতে হইত। একদিন একজন পদবিহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া, তাঁহার নিজের পদদ্বয় আছে এই ভাবিয়া ঈশ্বরকে তাঁহার প্রতি পরম করুণার জন্য বারংবার ধন্যবাদ দিলেন ও সেই অবধি পাদুকার অভাবের জন্য আর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর জ্ঞানার্জ্জনে যায়, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর তিনি দেশভ্রমণ ও বহুদর্শিতা লাভে এবং নিজলব্ধ জ্ঞানের প্রচারে অতিবাহিত করেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ প্রায় ১৭সতের বৎসর—তিনি নির্জ্জনে সাধু ফকিরের ন্যায় বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার সংযম ও গভীর ধর্ম্মভাব দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সংসারের বৃথা আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বলবতী ছিল। শেষে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে উদরান্নের জন্য সংসারে আসিতে হইত। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, উদরের জন্য মানুষের হস্ত পদাদি দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, উদরের দাস হইলে ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। যদি সাদির উদর তাঁহার পৃষ্ঠের ন্যায় ভারসহিষ্ণু হইত, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা কাহাকেও করিতে হইত না। এই কথায় তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, অর্থের জন্য তাঁহাকে পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। যে কারণেই কেন পুস্তক রচনা করুন না, পুস্তকগুলির দ্বারা জনসাধারণের যে মহোপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া জানান যায় না। সাত শত বৎসর ধরিয়া সেই সকল পুস্তক পৃথিবীতে আদৃত হইয়াছে। ১৩১৪ খৃঃ অব্দে এক শত কুড়ি-বৎসর বয়সে সিরাজনগরে সাদির মৃত্যু হয়। তিনি খর্ব্বাকার ও কৃশ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে কেশ ছিল না, এবং বেশ ভূষার কোনও পারিপাট্য না থাকায় তাঁহাকে হঠাৎ দেখিলে কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ আলাপেই তাঁহার গুণরাশির বিকাশে সকলেই মোহিত হইত—তাঁহার কদর্য্য বাহ্য দৃশ্যের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য থাকিত না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, বাক্‌পটুতা ও পরিহাসে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল, বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পারস্য ছাড়া তিনি আরও সপ্তদশটী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণনা করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বুস্তান ও গুলিস্তান এই দুই খানিতে তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আবার গুলিস্তানই অধিক সমাদৃত। এই পুস্তক গদ্য ও পদ্যে পারস্য ভাষায় রচিত। ১২৪৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই পুস্তক

প্রচার করেন। পুস্তকখানি আট অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা—

(১) রাজাদিগের আচার ব্যবহার।
(২) সাধুদিগের নীতি।
(৩) সন্তোষ।
(৪) নিরুত্তরের উপকারিতা।
(৫) প্রেম ও যৌবন।
(৬) বৃদ্ধ বয়সের নিঃসারতা।
(৭) শিক্ষার ফল।
(৮) সমাজের কর্ত্তব্য।

জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। একদিন পথে যাইতে যাইতে সাদি তাঁহার দুইজন প্রিয় বন্ধুকে দেখিতে পান। তাঁহারা তখন সুলতানের সহিত অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহিত দেখা করা অনুচিত এই মনে করিয়া সাদি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর না হন এমন ভাবে মহা সঙ্কোচে পথের এক পার্শ্ব দিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু বন্ধুদ্বয় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবিলম্বে অবতরন করিয়া সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনার কুশল ত? আপনার শুভ প্রত্যাগমনের বার্ত্তা এতদিন আমাদিগকে না দেওয়াতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি"। সুলতান এই ঘটনা দেখিয়া মনে মনে খেদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এই দুইজন অমাত্য তাঁহাকে এতকাল জানে, কিন্তু কখনও ত এরূপ সম্মান করে না। পরে বন্ধুদ্বয় সুলতানের সহিত মিলিত হইলে, সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ব্যক্তি কে?—যাহার প্রতি তোমরা এত সম্মান প্রদর্শন করিলে?" তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"সুলতান! উনি আমাদের পিতা"। সুলতান বলিলেন,—"তোমার পিতার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি বার বার বলিয়াছ,—তিনি মৃত; এখন বলিতেছ,—"এ ব্যক্তি আমাদের পিতা," তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"সুলতান! ইনি আমাদের পিতা ও পরমারাধ্য গুরু। ইনিই সিরাজ নগরের সেখ সাদি। ইঁহার জগদ্বিখ্যাত নাম বোধ হয় আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে।" তাহা শুনিয়া সুলতান বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সাদির রাজসভায় যাইবার অনিচ্ছা থাকিলেও বন্ধুদের অনুরোধে এক দিন তথায় গমন করিলেন। সুলতানের সহিত আলাপ করিয়া বিদায় লইবার কালে সুলতান সাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে একটা উপদেশ দিয়া যান। সাদি বলিলেন,—তুমি পরলোকে যাইবার সময়ে কিছুই সঙ্গে করিয়া লইতে পারিবে না, তথায় কেবল সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের দণ্ড হইবে। অতএব তুমি এই পৃথিবীতে দানশীল ও ধর্ম্মশীল হও। দেখ! রাজা ঈশ্বরের ছায়া; ছায়া প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ হওয়াই উচিত; রাজার সুশাসনে প্রজাপুঞ্জের স্বভাব ভাল হয়, প্রজার শান্তি

রাজার সুবিচারের উপর নির্ভর করে। যে রাজার শাসনের মূলে দুরভিসন্ধি ও অন্যায় আচরণ, তাঁহার শাসন কখনও শুভকর হয় না।

গুলিস্তান হইতে নিয়ে সাদির ধর্ম্ম-নীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে কতকগুলি উক্তি প্রদত্ত হইল।

১। একদা এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক তাহার সুন্দরী ভার্য্যাকে লইয়া নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে নৌকা আবর্ত্তে উল্‌টিয়া পড়িলে উভয়ে জলমগ্ন হইল। নাবিক তাড়াতাড়ি যুবককে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে যুবক বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া আমার প্রিয়তমাকে অগ্রে রক্ষা কর"। কিন্তু আর অবসর রহিল না, শেষে দুইজনেই প্রাণ হারাইল। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া সাদি বলিলেন,—"এইরূপে ঈশ্বরকে ভাল বাসিবে। সমস্ত পৃথিবী উপেক্ষা করিয়া যে তোমার প্রাণারাম, সেই ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণ অর্পণ কর।" (১)

২। মনুষ্যত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। তুমি কামাদি ষড়্‌রিপুর ক্রীতদাস, না ঈশ্বরের সেবক? যত দিন না ঈশ্বরের দাস হইতে পার, তত দিন তোমার মনুষ্যত্ব হয় নাই বলিয়া নিশ্চয় জানিবে।

৩। যে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছে, সে প্রকৃত জয়ী নয়। যে আপনার মনকে বশে আনিয়াছে, সেই যথার্থ জয়ী।

৪। মনুষ্য যেমন ভরণ পোষণের জন্য লালায়িত, তেমনি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলে দেবতাদের স্বর্গে স্থান হইত না।

৫। জ্ঞানী হইয়া সৎকার্য্য না করা ও মধুমক্ষিকার মধুসঞ্চয় না করা উভয়ই সমান।

৬। যে রাজা স্বয়ং ঈশ্বরের অধীন বলিয়া না স্বীকার করে, তাহার রাজত্ব করা উচিত নয়।

৭। এই জীবনে কি করিয়াছ, ঈশ্বর তাহাই জিজ্ঞাসা করিবেন, কাহার পুত্র তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না।

৮। রত্ন পঙ্কে পড়িলেও যে রত্ন সেই রত্ন। ধূলি আকাশে উড়িলেও যে ধূলি সেই ধূলি।

৯। সাধুর ভিক্ষা করিয়া অর্থ সঞ্চয় অপেক্ষা পাপীর অর্থ নষ্ট করা ভাল।

১০। লোক ভাল বলিবে বলিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে বিরত হইলে লাভ নাই। যদি ঈশ্বরকে পাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে গুহায় বাস করিয়া ফল কি?

---

(১) এই ভাবের একটী সংস্কৃত কবিতা আছে:—
"ত্বমগ্রতঃ সঙ্কর কোমলাক্ষি।
ত্বমেব জীবেশ্বর! নিঃসরাগ্রে।
ইতি ব্রুবদ্ বেশ্মনি বহ্নিদীপ্তে দৃঢ়ানুরাগান্মিথুনং বিপন্নম্॥
পতি।—প্রিয়তমে! তুমি অগ্রে কর পলায়ন,
পত্নী।—প্রাণেশ! তুমিই অগ্রে করহ গমন;
বলিতে বলিতে গৃহ জ্বলিয়া উঠিল,
জড়াজড়ি দুটীতেই পুড়িয়া মরিল।"
(শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন—প্রণীত কবিবচনসুধা, ১১৩ পৃষ্ঠা)।

১১। অসংযমী জ্ঞানী অপেক্ষা ধর্ম্ম-বিহীন মূর্খ ভাল। একজন দৃষ্টিহীন বলিয়া পথভ্রষ্ট হয়, অপর জন দুই চক্ষু সত্বেও নরক-কূপে পড়ে।

১২। ঔষধের গুণাগুণ না জানিয়া সেবন ও অপরিচিত পথে গমন, উভয়ই অবিবেচকের কার্য্য। প্রাণিমধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও কুকুর নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে, কৃতঘ্ন মানুষ অপেক্ষা কৃতজ্ঞ কুকুর ভাল।

১৩। মূর্খের সহিত কদাচ বাস করিও না; কারণ, তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইলেও মূর্খের সংসর্গে গর্দ্দভ হইয়া যাইবে। আর তোমার স্বল্প বিদ্যা থাকিলে মূর্খের সহ-বাসে ঘোর পাগল হইবে।

১৪। হে ঈশ্বর! তুমি পাপীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। সাধুদের প্রতি ত তোমার যথেষ্ট দয়া আছে, কারণ তুমি তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়াছ।

১৫। যে জন নিজ মস্তকচ্ছেদনের ভয় করে না ও পুরস্কারের প্রত্যাশা করে না, সেই ব্যক্তিই রাজাকে মন্ত্রণা দিবার উপযুক্ত।

১৬। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে কোরাণ পাঠাইয়াছিলেন—লোকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিবে বলিয়া, কেবল কোরাণের কথা-গুলি আবৃত্তি করিবার জন্য নয়।

১৭। এক জন দৈবজ্ঞ নিজ গৃহে প্রত্যা-গমন করিয়া দেখিল,—তাহার স্ত্রী একজন অপরিচিত লোকের সহিত একাসনে বসিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে দৈবজ্ঞ সেই লোককে গালি দিয়া প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। সাদি এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"যে নিজের ঘরের সংবাদ রাখে না, সে নক্ষত্রমণ্ডলে কি হইতেছে কেমন করিয়া জানিবে"।

১৮। কোনও রাজা একজন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কখনও আমার বিষয় ভাবিয়া থাক?" ফকির বলিল, "হাঁ! যখন আমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকি, তখন আমি তোমার বিষয় ভাবি। ঈশ্বর যাহাকে তাঁহার দ্বার হইতে দূরে রাখেন, তাহাকে সর্ব্ব স্থানেই ঘুরিতে হয়। যে ঈশ্বরের দ্বারে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছে, তাহাকে আর কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না"।

১৯। হাতিমতাইকে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার অপেক্ষা স্বাধীনচেতা লোক দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?" হাতিম,—"হাঁ। একদা আমি একটী মহাভোজ দিয়াছিলাম, সেই ভোজে অনেক লোকই আসে। ভোজ শেষ হইবার পূর্ব্বে আমি নগরান্তে যাইয়া দেখিলাম, একজন কাঠুরিয়া কাঠের বোঝা মস্তকে করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি হাতিম তাই-এর ভোজে যাও নাই কেন? সেখানে বহু-সংখ্যক লোক গিয়াছে"। কাঠুরিয়া বলিল, "যে আপনার শ্রমলব্ধ অন্নাহার করিবে, সে কেন হাতিমের অধীনতা স্বীকার করিবে?" তাহার কথায় আমি বুঝি-

লাম,—সে ব্যক্তি আমাপেক্ষা স্বাধীনতায় অনেক উন্নত।

২০। একজন ফকির একদা একটী মেষকে নেকড়ে বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সেই রাত্রিতে ফকির স্বয়ং মেষের গলায় ছুরি দেওয়াতে মেষ দুঃখ করিয়া বলিল,—"হায়! তুমি আমাকে ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া শেষে আমার পক্ষে সেই ব্যাঘ্র হইলে।"

২১। একদা কতকগুলি চোর এক ফকিরের বাটী প্রবেশ করিয়া ফকিরকে গালি দিয়া ও প্রহার করিয়া যায়। ফকির তাহার পিতার প্রেতাত্মাকে মহাকাতর-ভাবে এই কথা জানাইলে, এই প্রত্যাদেশ হইল যে,—কৌপীন অবলম্বন করিলে সকল সহিতে হয়, যে তাহা না পারে, সে কপট সাধু, তাহার কৌপীন লওয়া উচিত নয়। গভীর জলে প্রস্তর ফেলিলে জল আবিল হয় না। যে ধর্ম্মপথাবলম্বীর সামান্য কারণে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র জল। ক্ষমা ও ধৈর্য্যসহকারে লোকের পীড়ন সহ্য করিবে। ক্ষমাগুণেই পাপ প্রক্ষালিত হয়। যদি নিশ্চয়ই জান যে, অবশেষে এই দেহ ধূলায় পরিণত হইবে, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই ধূলার মত নম্র হইতে শিখ।

২২। একজন উকীলের একটী অত্যন্ত কুরূপা কন্যা ছিল। উকিল অনেক ধন রত্ন দিতে স্বীকার পাইলেও কেহ তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল না। শেষে সে ব্যক্তি একজন অন্ধের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে সিংহল দেশ হইতে তথায় চক্ষুরোগের চিকিৎসক আসিল। অনেকে কন্যার পিতাকে বলিল,—"আপনি কেন আপনার জামাতাকে ইহাঁকে দেখান না।" —কন্যার পিতা শুনিয়া বলিল,—"যদি সে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। কুরূপার অন্ধপতিই ভাল"।

২৩। আমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি লাম্পট্যের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ায় আমি একজন সাধুকে সে বিষয়ে অভিযোগ করিলাম সাধু বলিলেন,—"তুমি সংযম হইয়া তাহাকে লজ্জিত কর। তোমার চরিত্র এতদূর বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, যে, কেহ তোমার নিন্দা করিতে কখনও সাহস করিবে না। তানপুরায় সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে, গায়ক তাহার কর্ণ মলিয়া দেয় না।"

২৪। লোকে সিংহকে পশুরাজ, আর গর্দ্দভকে সকলের হেয় বলে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ভারবাহী গর্দ্দভকে মনুষ্যমাংসাহারী সিংহ অপেক্ষা ভাল বলেন। আবার যে সকল লোক পরের অনিষ্ট করে, তাহাদের অপেক্ষা ভারবাহী বলীবর্দ্দ ও গর্দ্দভ আরও ভাল।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

# সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সদ্‌গুরু বা সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ-জাতিত্ব-লাভের দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নহে। অধ্যাত্মরামায়ণে কথিত আছে, বাল্মীকি চণ্ডাল-ব্যাধাদি-সংসর্গে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া মহর্ষিকুলতিলক, কবিকুল-গুরু বাল্মীকি হন। নারদ দাসীপুত্র ছিলেন, সাধুসেবার মহিমায় দেবর্ষিত্ব লাভ করেন। চণ্ডালকন্যা শ্রমণা সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই বিশ্বনমস্যা, ভগবানের প্রিয়তমা ভক্তা 'সিদ্ধশবরী' হইয়াছিলেন। গুহক, চণ্ডাল হইয়াও ভগবানের প্রাণারাম সখা। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপোবললব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়া রাম-রূপী নারায়ণেরও গুরু হইয়াছিলেন (১)। মহর্ষি বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, কর্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতি শত শত, সহস্র সহস্র পুণ্যশ্লোক মহাত্মা, যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলেও মানবের কলুষরাশি বিদূরিত হয়, বলিতে কি, তাঁহাদের কাহারও জন্মের ঠিক নাই। এই জন্যই সর্ব্বার্থদর্শী মনু বলিয়াছেন;—

"ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্"—অর্থাৎ, মানুষ বয়সে বড় হইলে বড় হয় না; বড় কুলে জন্মিয়াও বড় হয় না; যাঁহারা সাঙ্গবেদাধ্যায়ী, সনাতন ব্রহ্ম-বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান। মানব যখন ব্রহ্মজ্ঞানে ধৃতপাপ হয়, যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়স্রোত ঈশ্বরগামী হয়, যখন ঊর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার মন-প্রাণ-আত্মা সকলি ঈশ্বরোন্মুখী হয়, তখন সে ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ, কুলীনেরও কুলীন,—আর্য্যকুলমুকুট।

মাদৃশ ব্যক্তির সামান্য বুদ্ধিতে, এ ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন সমাজে আর জাতি-কুল লইয়া বিসংবাদ করা উচিত নহে। যখন গুণ-দোষ লইয়াই জাতিত্বের উৎকর্ষাপকর্ষ, তখন, স্ব স্ব জাতির উৎকর্ষের দাবি করিবার পূর্ব্বে তদনুরূপ গুণোৎকর্ষ অধিকার করাই উচিত। এ ভগ্নসমাজে সমাজ-বিচ্ছেদকর ঘটনা যত না হয়, ততই ভাল। আপাততঃ অধিক দূর না গিয়া, গুণানুরূপ সবর্ণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। ভারতের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে বৈশ্যে এবং শূদ্রে শূদ্রে পরস্পর সবর্ণ। পরস্পর যোগ্য সবর্ণে যৌন সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, সকল দিকেই যে কত সুবিধা হয়, সমাজের যে কিরূপ কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা বলিয়া জানান যায় না। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

(১) এ সকল কথা মৎপ্রণীত তুলসীদাসের জীবনচরিতে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। উহা বামাবোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এজন্য, এস্থলে আর অধিক বলা হইল না।

বশিষ্ঠাদি পূর্ব্বপুরুষগণ, গুণোৎকর্ষ দর্শনে যদি অধমযোনিজারও পাণিগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মে পতিত হইয়া না থাকেন, তবে তাঁহাদের দাসানুদাস আধুনিক শিষ্যগণ সদ্‌গুণান্বিত সবর্ণে বিবাহ করিয়া, জাতি-ধর্ম্মে পতিত হইবেন কেন?

এই জাতিতত্ত্বের মীমাংসা সর্ব্বোপজীব্য মহাভারতাদি গ্রন্থের নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে নিরূপিত হইয়াছে। সে মীমাংসা সর্ব্বত্রই অভিন্ন। মহাভারতের বনপর্ব্ব, অজগরপর্ব্ব হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে;—পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে, একদা ভীমসেন একাকী ফলাদিসংগ্রহে বহির্গত হইয়া এক মহাকায় ভুজঙ্গ দর্শন করিলেন। ভুজঙ্গ ভীমকে ভোগবেষ্টনে বদ্ধ করায়, ভীম, নাগাযুতবলশালী হইয়াও স্পন্দনহীন হইলেন। তখন সেই মহানাগ ভীমকে কহিলেন,—আমি সামান্য নাগ নহি। আমি পূর্ব্বজন্মে মহারাজ নহুষ ছিলাম। পুণ্যবলে স্বর্গের অধীশ্বর হইয়াছিলাম। তথায় ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের অপমান করায় তদীয় শাপে এই বিকৃত নাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি বলিয়াছেন,—যিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তোমার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা ও তোমাকে এ শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। নহিলে, তোমারও উদ্ধার নাই এবং তোমার কবলে পতিত ব্যক্তিরও উদ্ধার নাই। ভীম তদীয় প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক কবলিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, ভীমের আগমন-বিলম্ব দেখিয়া, যুধিষ্ঠির ভ্রাতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রাণাধিক ভ্রাতাকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন। অনন্তর ভীমের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, সেই নাগের নিকট দীনভাবে ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। নাগ কহিলেন,—তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিব, নহিলে আমার কবল হইতে রক্ষা নাই। যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে চাহিলে, নাগ কহিলেন।

নাগ।—"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্! বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির!"

—হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? এ জগতে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু কি?

যুধি।—বেদ্য বস্তু—সেই সুখদুঃখাতীত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাহাকে লাভ করিলে, জীব শোক-মোহের অতীত হয়। আর, আপনি যে ব্রাহ্মণের কথা জিজ্ঞাসিলেন, সে বিষয়ে আমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া, বলিতেছি;—

"ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ।
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি
নির্দ্দিশেৎ॥"

—শূদ্র হইয়াও শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ শূদ্রবংশে বা ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, শূদ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। 'বৃত্ত' অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও।

এই কথা শুনিয়া নাগ কহিলেন,—যদি একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয়, তবে সেই চরিত্রের অভাবে, তাহার জন্মাধীন জাতিত্ব বৃথা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ;—

"জাতিরত্র মহাসর্প ! মনুষ্যত্বে মহামতে !
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—হে মহানাগ ! হে মহামতে ! সর্ব্ববর্ণমধ্যে সঙ্করতাজন্য মানবের জন্মাধীন জাতিত্ব সুদুর্জ্ঞেয়। উদ্দাম ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া মানবগণ সকল যোনিতেই অপত্যোৎপাদন করিতেছে। যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য জলচরের গতিবিধির নির্ণয় হয় না, যেমন অসীম আকাশে অসংখ্য খেচরের গতিবিধির নির্ণয় হয় না, তেমনি মানবের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ, এ কয়টীর নির্ণয় হয় না। অতএব যাঁহারা যজ্ঞশীল অর্থাৎ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি জ্ঞান-পুণ্যের অনুষ্ঠানেই সদা নিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

"ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়, গলায় পৈতা বামন নয়"। কপর্দ্দক মূল্যের কয়েকগাছি সূত্র স্কন্ধে লম্বমান করিলেই যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তবে এদেশের যুগী-জোলা-চাঁড়াল প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ, কেননা তাহাদের অনেকেই সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। অতএব এ জগতে একমাত্র পুরুষকারেই লোকের আত্মপরিচয়। মহাবীর কর্ণ কহিয়াছিলেন,—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

আমি সূতজাতিই হই বা সূতপুত্রই হই, যে কেহ হইনা, জন্ম দৈবায়ত্ত, পৌরুষ আমার আয়ত্ত, অতএব পৌরুষই আমার পরিচয়।

একটী কৌতুকাবহ পৌরাণিক কথা মনে হইল, তাহা এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি লোমভারে বড়ই অসুখী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। লোমশ করযোড়ে কহিলেন,—"ভগবন্ ! আমি আর কিছুই চাহি না, কাশ্মীরী ভেড়ার ন্যায় এ লোমভার হইতে আমাকে মুক্ত করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন,—"বৎস ! তুমি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই এ লোমসঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে।" লোমশও তদবধি নানাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার গাত্রের একগাছি লোমও স্খলিত হইল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া, পুনরায় বিরিঞ্চির শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন,—ভগবন্ ! আমার অদৃষ্টে ব্রহ্মবাক্যও বিফল হইল ! আমি আপনার আদেশে বহু ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম ; কৈ ? আমার একটী লোমও ত পতিত হইল না ! ব্রহ্মা ঈষৎ

হাস্য করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে উহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, সেই স্থানে হরিদাস নামে এক চণ্ডাল সপরিবার বাস করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফলমনোরথ হইবে। তখন মুনিবর সেই চণ্ডালের ভবনে গিয়া হরিদাসের নিকট অন্ন চাহিলে, সপরিবার হরিদাস ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া কাতরস্বরে কহিল,—ঠাকুর! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ।—এ অস্পৃশ্য, নীচাধম, পাতকী চণ্ডাল আপনাকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইবে? ক্ষমা করুন, অতিথিসেবায় আমরা সপরিবার আমাদের ধন প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহি। কিন্তু চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণঠাকুরকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইব? মহর্ষিকে তখন অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদা ঐ চণ্ডাল ভোজনে বসিয়াছে, ইত্যবসরে লোমশ অলক্ষ্যভাবে গিয়া তদীয় পাত্রস্থ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ নির্লোম ও নির্ম্মল হইল।

"চণ্ডালোঽপি ভবেদ্ বিপ্রো
হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

—"মুচি হলেও হয় শুচি, যদি কৃষ্ণ ভজে;
শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে।"

যদি কেহ কঠোর সাধনাবলে উচ্চ জ্ঞানধর্ম্মাদি অধিকার করে, তবে সে স্বতই শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের জাতি। যে দিন আমরা সকলেই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, একজাতি ও একপ্রাণ হইব, অহো! সে আমাদের কি আনন্দের দিন! যে দিন সকলের হৃদয়তন্ত্রী ভেদ করিয়া,—

"এক ব্রহ্ম এক বেদ,
জীবে জীবে নাহি ভেদ"

এই চৈতন্য-বাণী উত্থিত হইবে, অহো! সে কি আনন্দের দিন!—যে দিন আমরা সমস্ত বিশ্ববাসী অদ্বৈত সদ্ভাব নিগড়ে চিরবদ্ধ হইয়া, সকলে সমস্বরে ও প্রেমোচ্ছলিত হৃদয়ে বলিব,—

আয়ান্তু মূর্খ-বুধ-পাতকি-পুণ্যবন্তঃ
চণ্ডাল-বিপ্র-ধনহীন সমৃদ্ধিমন্তঃ।
নানাদরো নচ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা
সর্ব্বে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরঙ্কে॥

—আয়রে চণ্ডাল-বিপ্র পাপি-পুণ্যবান্!
আয়রে দরিদ্র-ধনি-জ্ঞানী বা অজ্ঞান!
নাহি তথা লজ্জা-ভয়-মান-অপমান,
মা'র কোলে অধিকার সবারি সমান।

অহো! সে আমাদের কি আনন্দের দিন! মাগো! ব্রহ্মময়ি! কতদিনে মা! আমাদের সে শুভদিন আসিবে?

অনেকের এইরূপ ধারণা।—লৌকিকতারক্ষাই লোকের মুখ্যধর্ম্ম। প্রকৃত-

পক্ষে, যে লৌকিকতার সহিত বিশুদ্ধ আত্মার বা হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। মনে কর,—স্বর্গত পিতা মাতার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্যে সমাজকে আহ্বান করা একটী লৌকিক বা সামাজিক কার্য্য। কিন্তু শ্রাদ্ধ-কার্য্যের মূলবন্ধন—পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা-ভক্তি। তুমি তোমার পরমগুরু, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর পিতামাতার জীবদ্দশায় পদে পদে তাঁহাদের মনঃপীড়া দিয়াছ। অনন্তর তাঁহাদের পরলোকগমনে তুমি সমস্ত সমাজ আহ্বানপূর্ব্বক ধূম ধাম করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিতেছ। এস্থলে তোমার সামাজিকতা রক্ষা হইলেও, তোমার প্রকৃত শ্রাদ্ধ করা হইল না। সমাজে তুমি ধন্য ধন্য হইলেও, ধর্ম্মের নিকট, ঈশ্বরের নিকট, তুমি যে কুলাঙ্গার, সেই কুলাঙ্গারই রহিলে। পক্ষান্তরে, তুমি তোমার পিতা-মাতার যাবজ্জীবন, নিজ মন-প্রাণ-আত্মার সমস্ত শক্তি দ্বারা অবিচলিত ভক্তিযোগে তাঁহাদের সেবা করিয়াছ, কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ সমাজ আহ্বানপূর্ব্বক, ঘটা করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে না, যথাকালে গভীর ভক্তিযোগে তাঁহাদের অক্ষয় প্রীতি-কামনায়, এক বিন্দু তিল-জলমাত্র উৎসর্গ করিলে। এস্থলে ধর্ম্ম ও যুক্তি উভয়তই তোমার শ্রাদ্ধ পূর্ণ হইল। যাঁহারা পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত দরিদ্রকে বলপূর্ব্বক ঋণ করাইয়া শেষে তাহার বাস্তভিটাটুকুও বিক্রয় করাইতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা সমাজরক্ষক নহেন, সমাজের ঘোর শত্রু। "যদন্নঃ পুরুষো রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ"—লোকে নিজ অবস্থা মত স্বয়ং যাহা ভোজন করিয়া থাকে, তাহার পিতৃলোক ও দেবলোকও তাহার নিকট তাহাই কামনা করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সমাজসংস্কারের নাম প্রত্যেকের গৃহসংস্কার। কেননা সমাজ গৃহসমষ্টিমাত্র। একমাত্র গৃহশিক্ষার অভাবই সমাজব্যাপী বিশাল অমঙ্গলের নিদান। যে শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া বাজারের বিকৃত দুগ্ধে পালিত হয়, তাহার শারীরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, গৃহশিক্ষাহীন, বহিঃশিক্ষায় পরিবর্দ্ধিত মানবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই দুর্দ্দশা ততোধিক। স্নেহময়ী জননী, পত্নী প্রভৃতির স্বহস্তপাচিত অন্ন-ব্যঞ্জন ও বাজারের (হোটেলের) প্রস্তুত করা অন্নব্যঞ্জনে যে প্রভেদ, পুত্রকল্যাণময়-জীবন পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রদত্ত শিক্ষায় ও বিদ্যালয়ের বৈতনিক গুরুর ঘড়িধরা শিক্ষায় ততোধিক প্রভেদ। একটী শিক্ষা প্রেমময়, মঙ্গলময়, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত, অপরটী স্বার্থ হইতে উত্থিত। একটী শিক্ষা সার্ব্বকালিক, অপরটী পরিচ্ছিন্ন দেশ-কালে সীমাবদ্ধ। একটী সূর্য্যালোক, অপরটী দীপালোক। ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন;-

"পিতুরস্তঃপুরে দত্তাৎ মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

—পিতা বা পিতৃতুল্য গুরুজনকে অন্তঃপুরের ভার দিবে, মাতা বা মাতৃতুল্যাকে পাকশালার ভার দিবে, গো-সেবায় আত্মতুল্যকে নিযুক্ত করিবে, কৃষি-বাণিজ্যাদি বিষয়কার্য্যে (অন্যের উপর ভার না দিয়া) স্বয়ং করিবে। কথায় বলে,—"স্বচক্ষে সোণা ফলে।"

(ক্রমশঃ)।

---

# আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম।

[ Out of my new work "আমি"। ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি যদি চিৎ স্বরূপ, তবে আমার এত দুঃখ কষ্ট কেন? আমি সর্ব্ব দুঃখ তাপের অতীত হইতে পারিতাম,—যদি সেই অনন্ত চিৎস্বরূপকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে সেই চিৎস্বরূপে দর্শন করিয়া, শাক্যসিংহের মত, সর্ব্বজীবে অহিংসা ও স্নেহ করিতে পারিতাম,—কিম্বা, যদি সেই পরমাত্মাই সর্ব্ব বস্তুরূপে রহিয়াছেন, ইহা নিশ্চিতরূপে, সম্যক্ প্রকারে, জানিতাম। আমি তো আজীবন পাপের বৃশ্চিকদংশনময় পথেই চলিয়াছি,—সুখের, মঙ্গলের পথে, চলি কই যে, সে সুখ, সে আনন্দ লাভ করিব? এখনও, যখন প্রশংসাতে আনন্দ,—নিন্দাতে দুঃখ, ক্রোধ,—ধনে লোভ, দারিদ্র্যকে ভয়, ঘৃণা,—মানুষের কাছে, দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপ ঢাকিতে চাই,—ভোগ্য বিষয় লাভে সুখ, অলাভে নিরানন্দ রহিয়াছে, তখন তো, কষ্টিপাথরে আমাকে কসিয়া দেখা হইয়াছে যে, আমি দগ্ধহেমবৎ, এখনও শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে পারি নাই। ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্ম-প্রচারক মহর্ষি মহম্মদ কোরাণের এক সুরাতে উপদেশ দিয়াছেন,—"দুষ্টামি ও দুষ্টামির ভাবও পরিত্যাগ কর। যাহাদের পাপই অর্জ্জন, তাহারা যে ফল উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাই পাইবে?" তবে, আমি সুখ, শান্তি পাইবার কামনা করি কেন? মহাপ্রাণ মহম্মদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"যাঁহারা জীবনের বৃথা আড়ম্বর এবং কামাদি ইন্দ্রিয়চর্চ্চা হইতে বিরত হয়েন, ভিক্ষা দেন, প্রার্থনা উপাসনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও বাক্য পালন করেন, তাঁহারাই চিরসুখের,—অনন্ত সুখের উত্তরাধিকারী হইবেন।" হজরৎ আরও বলিয়াছেন,—"যাঁহার সৎ কার্য্যের খাতায় জমা বেশি হইবে, তিনিই সুখের জীবন যাপন করিবেন। যাঁহার জমা কম হইবে, তিনি নরকের গর্ত্তে বাস করিবেন।" এ জীবনের সুখের ও উপভোগ্য প্রেয় বস্তু লইয়াই থাকিলে, আমি হৃদয়ে,—জীবনে নরকযন্ত্রণাই ভোগ করিব,—স্বর্গসুখ কেনই বা পাইব?

আমি এত দুঃখ কষ্ট পাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি নিজ চেষ্টা দ্বারা, দুঃখের হাত ছাড়াইয়া, সুখের,—এবং যদি পারি তো, —অনন্ত সুখের অধিকারী হইব,

বলিয়া। দুঃখ কষ্ট, পাপ তাপ আমার আত্মাকে ফুটাইয়া দেয়,—রসিক রসপূর্ণ করিয়া দেয়। যেমন, রসপূর্ণ হইলে সুপক্ক দাড়িম্ব ফল ফাটিয়া যায়,—যেমন, নিদাঘের প্রচণ্ড-তপন-তাপে তাপিত না হইলে, বোম্বাই, ফজ্‌লী, লেঙ্গড়ার মধুক্ষরণ হয় না, তেমনি রসপুষ্টি ও রস-সঞ্চারের জন্য বিধাতা দুঃখের ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমি যা চাই, তাই পাই। চাই মানে, আমার আত্মাতে যাহার প্রকৃত অভাব,—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়,—তা পাই। তা যোগাইবার বন্দোবস্ত আপনা হইতেই কার্য্য করিতেছে। এক অদৃশ্য আকর্ষণের গুণে, লৌহ-ধূলি, লৌহরেণু যেমন চুম্বকের দিকে দৌড়িয়া যায়, তেমনি আমার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে, এক অদৃশ্য টানে, আমার আত্মার দিকে টানিতে পারি। তাই ঈশা বলিয়াছেন, "চাও, তবেই পাবে। খোঁজ, তবেই মিলিবে। আঘাত কর, তবেই খুলিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত হন, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

আমি-র চাই কি, না ব্যাকুল চাহা, পিপাসা, পূর্ণ বিশ্বাস। তবেই যা চাই, তাই পাই। টাকা চাহিলে, টাকা পাই, —পুস্তকের অভাব হইলে, ঠিক যে পুস্তক প্রয়োজন, তাহাই হাতে আসিয়া পড়ে,—যে লোক, বা যে সাধু বন্ধুর সহবাস দরকার, তিনি আপনিই আসিয়া জুটেন,—যে অবস্থাতে উপনীত হওয়া উচিত, তাই লাভ হয়,—এমন কি, যে দুঃখ ক্লেশ, যে পাপ, তাপ না হইলে, আমি দাঁড়াইয়া থাকিব, অগ্রসর হইতে পারিব না, সেই চোট ও সেই পতনই আমার জন্য প্রস্তুত দেখিতে পাই! প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত পুরুষ, সেই অভাবের বস্তুর এমনই সুন্দর যোজনা করেন!

আমি-র মধ্যে এমন একটা আপনাপনিই হিসাব নিকাশ করিবার যন্ত্র বা বন্দোবস্ত আছে যে, চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা হইবামাত্র, উহা আমি-তে স্থায়ীভাবে আঁচড় মারে, দাগ দেয়, যেন রেজিষ্টার্ হইয়া যায়! প্রত্যেক রোগ যেমন শরীরে একটা স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়,—তেমনি প্রত্যেক কু-চিন্তা, কুভাব, কু-ইচ্ছা, কুকার্য্য আমি-র মধ্যে, — আমি-তে, — আমি-র জীবনে একটা চিহ্ন,—একটা রং রাখিয়া যায়। আমি পরকে ঠকাইলে, সেই অধ্যাত্ম বিচারযন্ত্রের তুলাদণ্ডের নিকট আমি নিজেই ঠকি। ঠকাইতে না পারিলেও,—ঠকাইবার ইচ্ছা প্রাণে উদিত হইলেই, আমি ঠকিলাম,—প্রাণের উপর ময়লা পড়িল, দাগ লাগিল, আমি-কে নীচ, ছোট, প্রতারিত করিল।

কু হইতে, কু ইচ্ছা, ভাব ও চিন্তা হইতে, নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলেও, মুক্ত হইবার কামনা, পিপাসা, মুমুক্ষু ভাব উদিত হইলেই, কোথা হইতে

সাহায্য পাই! কবিকুলতিলক মিল্টন গাহিয়াছেন, "আত্মা একান্ত শুদ্ধির ইচ্ছুক হইলে, সহস্র দেবদূত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে ও রক্ষা এবং পরিচর্য্যা করিবে।" "ধর্ম্ম হীনবল হইলে, স্বর্গের দেবতা তাঁহার নিকটে, এই মর্ত্ত্যেই নামিয়া আসিবেন।" আমিটীকে ফুটাইয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এতই বিচিত্র আয়োজন! বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে অণু পরমাণু লুপ্ত হয় না, তবে আমি একেবারে হারাইব,—ডুবিব কেন?

আত্মপরীক্ষার অভাবে আমি ভাল হইতে পারি না। আমি আত্মপ্রসাদে,—ভ্রান্ত আত্মমর্য্যাদাতে পরিপূর্ণ! কেবল পরের দোষ ও ছিদ্র দেখি। এ কেমন, ও কেমন, সে কেমন, এই বিচার ও রায় ফয়সালাতেই দিন গেল,—জীবন কাটিল! আমি-র ভিতরটা,—আমি-র দোষগুণ একবার দেখাও হইল না,—তো, সংশোধনের চেষ্টা হইবে কি প্রকারে? তাই মহাত্মা সক্রেটীশ বলিয়াছেন,—"এই প্রকার আত্মপরীক্ষা ব্যতীত জীবন জীবনই নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—আত্মপরীক্ষাই মানবের উপযুক্ত পাঠ, বিচার্য্য বিষয়।" আমি আমার এই অশেষ অজ্ঞানের বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। অজ্ঞানের কথা জানিলে, নিউটন, সক্রেটীসের মত জ্ঞানী হওয়া যায়। না জানিলে, মহামূর্খ হইতে হয়। তবু আমি এই অজ্ঞানকেই জ্ঞান মনে করিয়া, এত দম্ভ করি। কবে যে এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিবে, তা জানি না! তাই, প্রাণস্বামীর চরণ-তরণীর পাল্ দেখিতে পাইবার আশায়, ভবের কূলে বসিয়া আছি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

---

## স্বর্গীয়া ব্রজসুন্দরী দেবী।*

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে নদিয়া জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বাঞ্চলে মহিষাডাঙ্গা গ্রামে অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামীদিগের কুলে গিরিলাল গোস্বামীর ঔরসে ব্রজসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ঘোড়াদহ গ্রামের ঘোর শাক্তধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত চৌধুরীবংশের রামকমল চৌধুরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তিনি গৃহলক্ষ্মীরূপে আদৃতা এবং উক্ত চৌধুরীদিগের সুবৃহৎ সংসারে যথেষ্ট শ্রম, ধীরতা ও যত্নসহকারে সকলের সেবা করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। রামকমল চৌধুরী তাঁহার পিতার চতুর্থ পুত্র বলিয়া তাঁহাকে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীরা "ন-চৌধুরী" বলিয়া ডাকিত, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্রজসুন্দরীও 'ন-ঠাকুরাণী' বলিয়া সাদরে সম্ভাষিতা হইতেন।

* 'ধর্ম্ম ও কর্ম্ম' হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত।

ব্রজসুন্দরী দেবী ভক্তিসহকারে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও গুরুজনদিগের সেবায় সতত মনোযোগিনী থাকিতেন, এজন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রিয় পুত্রবধূ বলিয়া পরিগণিতা ছিলেন। সমগ্র পরিজনদিগকে তিনি স্নেহ ও মমতার চক্ষে দেখিতেন, এ কারণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। গোস্বামী বৈষ্ণবদিগের কন্যা শাক্তগৃহে আসিয়া যেরূপ ভক্তি ও শক্তির সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতেন, তাহা দেখিলে বোধ হইত যে তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া গৃহের নারীদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। সেরূপ আদর্শ এ যাবৎ আর ঐ বংশে পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভিক্ষাকর চৌধুরীর স্বর্গারোহণের পর যখন স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে ও ভাগ্যদোষে তাঁহার পুত্রেরা পৃথক্ হইলেন, তখন তিনি স্বতন্ত্র গৃহের গৃহিণী হইয়াও পৃথগন্ন পরিজনদিগের প্রতি কখনও অন্তরে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন নাই। পার্থক্য হেতু পূর্ব্বস্নেহমমতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, এজন্য তিনি তাঁহাদিগের প্রতি যথাবিহিত কর্ত্তব্য অধিক যত্নসহকারে সাধন করিতে তৎপর থাকিতেন। অনেক সময়ে স্বগৃহের কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও জ্ঞাতিদিগের অভাবমোচনে এবং তাঁহাদিগের সেবা ও কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাঁহার উদার প্রকৃতি ও অন্তরের স্নেহপূর্ণ ভাব কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়া সেবিতদিগের মন মুগ্ধ করিত। বৈষ্ণবের ভক্তি ও শাক্তের শক্তি এই উভয়ের সমাবেশে তাঁহার জীবন এত মধুময় ও প্রভাবশালী হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত, এবং "ন-ঠাকুরাণীর মত দয়া করিতে কাহাকেও দেখা যায় না" এই কথা ঘোড়াদহের তখন সকলের মুখে শুনা যাইত। এখনও তিনি স্মরণপথে আসিলে ঐ গ্রামের বৃদ্ধারা তাহাই বলেন। ব্রজসুন্দরী তাঁহার সন্তানদিগকে যেরূপ মোহমায়ারহিত হইয়া গভীর স্নেহদানে ও তীব্র শাসনে লালন পালন করিতেন, পল্লীগ্রামবাসিনী নারীদিগের মধ্যে সেরূপ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার সন্তানেরা ভাল কাজ করিলে তিতি তাহাদিগের প্রতি কতই সন্তুষ্ট হইতেন এবং কখন কখন সমবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের নিকট সেই কথা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আবার যদি কোন সন্তানের কোন অন্যায় কাজ বা মন্দ লক্ষণ দেখিতেন, তবে তাহাতে বড়ই বিষণ্ণ হইতেন এবং প্রয়োজন হইলে তীব্র দণ্ডদান বা তিরস্কার করিয়া তাহাকে সংশোধন করিয়া দিতেন। গ্রামবাসীদিগের বালকবালিকাদের সহিত যদি তাঁহার কোনও ছেলে মারামারি করিত এবং মার খাইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ করিত, তবে তিনি নিজ সন্তানকেই আবার নিজে দণ্ডদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আবার যদি কেহ বলিত যে,—"ন-ঠাকুরাণী, তোমার ছেলের কোন দোষ নাই, অন্য ছেলের দোষ, নিজের ছেলেকে

মেরো না", তখন তিনি বলিতেন, "দোষ আমারই ছেলের, নইলে ও মারামারি করিতে যায় কেন ?" আবার কোন কোন কলহপ্রিয়া মাতা নিজের ছেলের আবদারের কথা শুনিয়া, অন্যায়রূপে ন-ঠাকুরাণীকে তাঁহার ছেলের দোষ দিয়া দুকথা কষ্টভাবে শুনাইবেন মনে করিয়া তাঁহার নিকটে আসিলে দেখিতেন, তিনি নিজেই নিজের ছেলেকে শাসন করিতেছেন ; তখন নির্ব্বাক্ হইয়া তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলে ছেলেপিলের মারামারি লইয়া মায়ে মায়ে যেরূপ কলহ বিদ্বেষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ন-ঠাকুরাণীকে কেহ কখন সেরূপ কলহে লিপ্ত হইতে দেখে নাই। এ সম্বন্ধে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার বিস্তর প্রশংসা করিতেন। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তাঁহার প্রশংসা করিতে গিয়া ইহাও বলিত,—"ন-ঠাকুরাণী যেন দেবতা।"

চৌধুরীগৃহে পুণ্যাত্মা ভিক্ষাকর চৌধুরীর সময় হইতে "বার মাসে তের পর্ব্ব" এই প্রবাদবাক্য প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সময়ে দুর্গোৎসবের খুব ধুমধাম হইত। ভিক্ষাকরের পুত্রেরা

পৃথগন্ন হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে উহা শিথিল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপিও ঐ সকল পালপার্ব্বণ অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদি বংশপরম্পরায় কোনরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ১৮৬১ বা ৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজসুন্দরী দেবীর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, প্রায় ১৬ বৎসরের যুবা, ম্যালেরিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্গাপূজার সময় বাহির বাটীতে সকালবেলায় পূজা দেখিতে আসিয়া, মিষ্টান্নভাণ্ডারের রক্ষক, তাহার প্রায় সমবয়স্ক, এক ভাগিনেয়ের নিকট হইতে কিছু মিষ্টান্নাদি লইয়া, গোপনে ভোজন করিয়া, পরে বৈঠকখানায় গিয়া বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ঐ যুবা সান্নিপাতিক বিকারে আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে পূজার বাটীতে ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ তখন চণ্ডীমণ্ডপে ঘোরঘটায় সন্ধিপূজা চলিতেছিল। সে সময়ে ঐ যুবার হঠাৎ মৃত্যু হইলে নানা বিঘ্ন ঘটিবে ও সদ্যপ্রস্তুত করা অনেক প্রকার পূজার উপকরণ নষ্ট হইয়া দৈববিপাক ঘটিবে বলিয়া, এক মহা আশঙ্কা ঐ পূজার বাটীতে এবং আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদিগের মনে উদয় হওয়াতে সকলেই উৎকণ্ঠিত ও বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মুমূর্ষু পুত্রের মাতা ব্রজসুন্দরী দেবী রন্ধনশালায় তখন দুর্গাপূজার ভোগ রন্ধন করিতেছিলেন ; তখনও তিনি জানেন না যে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া যমের সহিত তাঁহার স্বামী বাহির বাটীতে সংগ্রাম করিতেছেন। রামকমল চৌধুরী তাঁহার নিজের জানা ও সঞ্চিত ঔষধে এবং স্থানীয় চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না পাইয়া, পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া বড়ই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু শোকে অধীর হন নাই। এমন

সময়ে পিপলখোলা গ্রামের একজন বৃদ্ধ পাঠান ধার্ম্মিক পুরুষ আসন্নকালের রোগী বাঁচাইতে পারেন শুনিয়া, তিনি তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইলেন। রোগীর তখন শেষাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। পাছে ঘরে মৃত্যুসংঘটন হয় এই মনে করিয়া, এ সম্বন্ধে কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ মুমূর্ষু রোগীকে বাহিরে বাহির করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এমন ঘোরতর শোকের সময় ব্রজসুন্দরীর এক অতি প্রিয়া কন্যা চক্ষু মুছিতে মুছিতে যেখানে তাহার মাতা দুর্গাপূজার ভোগ রন্ধন করিতেছিলেন, সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না দেখিয়া, মাতা ধৈর্য্য ও মাধুর্য্য সহকারে তাহাকে বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি! তা তোমরা কিছু বল আর নাই বল, মায়ের ভোগ রাঁধা ছাড়িয়া উঠিব না!" এই কথা তাঁহার কন্যার মুখে শুনিয়া পূজার বাটীর সকলে যেন একটা সৎসাহস পাইলেন এবং "ন-ঠাকুরাণীর অটল ধর্ম্মবিশ্বাস ও আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশীলতা" দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনবর্গ ও গ্রামবাসিগণ অবাক্ হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে সেই শুভ্রশ্মশ্রুধারী পাঠান চিকিৎসক আসিয়া সংজ্ঞারহিত মৃতবৎ রোগীর নাসায় কি এক নাস প্রদান করিলেন, তাহাতে রোগীর চেতনা হইল। পরে সেই চিকিৎসক বলিলেন,—"আর ভয় নাই, বাঁচিবে।" ভগবৎকৃপায় সেই ব্রাহ্মণ-তনয় কালের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইল। রোগী তখন চেতনা লাভ করিয়া শয্যাপার্শ্বে শুভ্রশ্মশ্রুধারী সৌম্যমূর্ত্তি চিকিৎসককে কেমন এক ভক্তিভাবে দর্শন করিল এবং নিকটস্থ সকলেই আশ্বাসিত হইলেন। পরদিন সেই রোগী স্বয়ং ধীরে ধীরে হাঁটিয়া কয়েকজন পরিজনসহ গৃহাভ্যন্তরে গেলে তাহার স্নেহপূর্ণা দেবীসমা মাতা তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র আরোগ্য লাভ করিবার কিছুদিন পরে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তখন সেই পুত্র মাতৃশোকে অধীর হইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে পড়িয়া রোদন করিয়াছিল। পরে সে কোথায় চলিয়া গেল!

---

## জীবন।

জীবন কি? আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান্ এবং আদরের সামগ্রীই আমার জীবন। কাল-সমুদ্রের একটী তরঙ্গই আমার জীবন, ইহাই শুনিতে পাই। গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—"শতং জীব।" কালের এক স্থান হইতে অন্য এক স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, ইহাই জীবন। জড়জীবন, পশুজীবন, মনুষ্যজীবন কালের ব্যাপ্তিমাত্র। ইহা বর্ষ,

দিন, মাস, যুগ প্রভৃতি দ্বারা গণনা করা যায়। যদি জীবন কেবল তাহাই হয়, তবে এত রোদন, এত হা হুতাশ, হা হতোস্মি, বৃথাই মনে হয়। কেবল কালের বক্ষে ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ একটী রেখার জন্য এত ক্লেশ কেন? ইহা না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? ইহা থাকিলেই বা লাভ কি? জলের রেখা, বালুকার রেখার মত, উহা উঠিয়া গেলেই বা এত রোদন কেন?

সূচাগ্রে যে শুক্র থাকে, তাহাতে কোটি কোটি জীবাণু রহিয়াছে। উহারই একটী-মাত্র মাতৃজরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া লালা, পরে মাংসপিণ্ড, পরে নরনারী আকারে পরিণত হইয়া, ও গতিশীল ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন হয়। এই প্রকারেই মানবজীবনের আরম্ভ হয়, দেহ-বিজ্ঞান বলেন। এই তত্ত্ব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। মানবের এই প্রকার অণু হইতেও অণু হইতে উৎপত্তি বলিয়াই মানবের বুঝি এত অহঙ্কার! এক সূচাগ্রে যে বীর্য্য থাকে, তাহাতে একটি দেশের সমুদায় লোকের উৎপত্তি হইতে পারে। এক বিন্দু শুক্রমধ্যে কোটি কোটি মানব, কোটি কোটি দিল্লীশ্বর, ঈশা, মুসা, কালিদাস, হোমর থাকিতে পারে। ইহাই মানব-জীবনের দৈহিক ও পার্থিব উৎপত্তির ইতিহাস। ইহা স্মরণ থাকিলে প্রকৃত বিনয় জন্মে। আমরা ছোট লোক বলিলে অহঙ্কারে, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠি। কিন্তু শুক্র শোণিত হইতে ও কীটাণুকীট হইতে উদ্ভব যদি সত্য হয়, তবে আপনাকে বড়লোক, অভিজাত ভাবিয়া কে আত্মপ্রত্যয়িত হইতে চাহেন? এত দিনে দেখিতেছি,—হিন্দু সাধকেরা কেন দেহ-তত্ত্বের এতই গৌরব করেন। আরও দেখিতেছি যে, এই মানবজীবন কীটাণু-কীট হইতে জাত বলিয়া, অন্য আর একটী শক্রতাভাবাপন্ন কীটাণুকীট হইতে ইহার এত ভয়। একটী কীট আর একটী কীটকে পরাজিত করিবে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে' চীত' করিবে, তার আর বিস্ময় কি? আমরা রক্ত, লালা, অস্থি, চর্ম্ম, মাংসপেশী দ্বারা জড়িত হইয়া স্থূলাকার দেখাইতেছি;—নিজের চক্ষে ভ্রান্ত ও মনে মনে বড় লোক হইয়াছি বলিয়া আমাদের জাতি ভ্রাতারা ভ্রান্ত ও ভীত হইবে কেন? তাই ম্যালে-রিয়া, বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি রোগের "ভায়াদ-কীটেরা ( Microbe ) ভায়াদি করিয়া আমাদিগকে এত বিপন্ন করে। তাহারা এত ছোট যে বহুমূল্য সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে দেখা যায় না। তুমি ও আমি এত ছোট, কিন্তু আমরা আমাদের চক্ষে কত বড়।

এই মানবের জীবন মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ অদৃশ্য জীবাণু বা কীটাণুরূপে মানব কাল-সমুদ্রে লীলা করিতেছে, জীবনতরী-খানি বহিয়া চলিয়াছে। জড়-বিজ্ঞান-চক্ষু এই জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-দেহের ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। এই দৈহিক ধ্বংসকে মানবজীবনের শেষ

বলিয়া থাকে। এই ধ্বংসকে মানবজীবনের শেষ মনে করিতে মানব প্রস্তুত নহে। মানব মরণের উপকথা শুনিতে চাহে না। তাহার কারণও আছে। মানবদেহরূপে জন্ম হইবার পূর্ব্বে যদি অদৃশ্য আকারে আমি-রূপ জীবাণুর অস্তিত্ব সত্য হয়, তবে ঐ দেহের উপকরণসমূহের বিকৃতি, বিশ্লেষ প্রভৃতির পরেও, ঐ জীবাণুর পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব না থাকিবেই বা কেন? তাই, মানবহৃদয় তাহার অস্তিত্বে একবার দখলীকার হইয়া পুনঃ সত্বর বেদখল হইতে রাজি নহে। তাই সে কথা মানিতেও রাজি নহে, সে মত স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করে না।

তাই মানব "মরণ" দেখিয়াও জানে, আমি অমর। মানবজীবনের অনন্তত্ব বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র নানা প্রমাণ দ্বারা মানবের জীবনস্বত্ব স্থাপনা করে। ইহার প্রধান উকিল মহাত্মা সক্রেটীস। ইহা ইতিহাসের বিষয়। এই সমুদায় চিন্তা ও ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, চট্ করিয়া কোন রোগের বা স্বাভাবিক দেহ-ক্ষয়ের জীবাণু, আমাকে জীবন হইতে বেদখল করিতে পারিতেছেন না। মানব মরণের এ ছেলে ভুলানো ছড়া বা ভূতের ভয় করে না।

ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে স্বত্ব একবার বর্ত্তে, তাহা আর নষ্ট হয় না। সংসারের ব্যবহারাজীবেরা যাহাই বলুন, অধ্যাত্মরাজ্যের প্রধানেরা, এড্‌ভোকেট্ জেনারেলগণ, ঋষি মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, মানব-আত্মা অবিনাশী। ইহা কতই বিজ্ঞানের, দর্শনের, আইনের, আশার ও জোরের কথা। আমাকে তোমরা কেহ এ জীবন হইতে বেদখল করিতে পার না, কখনও পারিবে না। আমি ছিলাম, আমি আছি, এবং আমি থাকিব। বিজ্ঞান বলেন, যন্ত্রে দেখ। সাধক বলেন, দেহতত্ত্বে দেখ। সক্রেটীস বলেন, আপনাকে জান। হিন্দু মহর্ষিগণ বলেন, আত্মবিৎ হও।

এই প্রকারে দেখিলাম যে, কালদেহের উপর মানবজীবনরূপ যে সরল রেখা রহিয়াছে, উহার অন্ত নাই। অন্ততঃ অন্ত আছে ভাবিবার কোন কারণও নাই; এবং বিপরীত সত্যটাই নিত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও, জীবন কি বুঝিলাম না। আত্মা তৃপ্ত হইল না। এমন থাকা, না থাকা প্রায়ই তুল্য; কেবল থাকিয়া কি হইবে? কিরূপে থাকা উচিত, ইহার মীমাংসার প্রয়োজন। এবং সেই মীমাংসানুযায়ী কালযাপন করা, আমার জীবনতরীটী তদনুরূপ চালিত করা প্রয়োজন।

শিশুকালে জানিতাম যে, জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে অশেষভাবে বসিয়া থাকাই জীবন। মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাই মরণ। পরে ভাবিতাম, দিবানিশি ক্রীড়াসক্ত থাকাই জীবন। ক্রমশঃ দেখিলাম, দেহের বল উপার্জ্জন করাই জীবন। পরে জানিলাম, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া জীবন। কেহ কেহ বলিলেন, জীবনের প্রধান লক্ষ্য বড়

হওয়া। কেহ বলিলেন, গৌরব উপার্জ্জন করাই জীবন। শাস্ত্র বলিলেন, "কীর্ত্তি-র্যস্য স জীবতি।" আত্মীয়স্বজনেরা, বন্ধু বান্ধবেরা বলিলেন,—"উকিল হও, হাই-কোর্টে যাও। ইহাই উত্তম জীবন।" কেহ বলিলেন, "বড় পদ লাভ কর। হাকিম হও। ইহাই জীবন।" এই সমুদয় পরামর্শে হৃদয় তৃপ্ত হইল না।

দেশহিতৈষী বলিলেন,—"স্বদেশ-প্রেমই জীবন।" পরোপকারী বলিলেন, "দয়াই জীবন।" সাধু বলিলেন, "ধর্ম্মই জীবন।" প্রেমিক বলিলেন, "প্রেমই জীবন।" কবি বলিলেন, "কবিত্বরসে সিক্ত থাকাই জীবন।" গায়ক বলিলেন, "শব্দমাধুর্য্যে মগ্ন থাকাই জীবন।" সংসারের বড় লোকেরা বলিলেন, "টাকাই জীবন। যার টাকা নাই, সে ছোট লোক। তার মরা উচিত।" কিন্তু মরা উচিত, মৃত্যু আছে, এ কথা মানবহৃদয় কখনও স্বীকার করে নাই, করিবে না। জ্যোতির্ব্বিৎ ও বৈজ্ঞানিক বলেন, নব নব গ্রহ আবিষ্কার করা, নব নব সত্য দেখাই জীবন।"

ঐ গোলাপ বৃক্ষটীর জীবন এক প্রকার। ঐ সরোরুহের জীবন এক প্রকার। ঐ কুসুমকলিকার, ঐ জ্যোতিষ্কের, ঐ কীটের, এবং ঐ বিহঙ্গমের জীবন এক প্রকার। সাগরগর্ভমগ্ন প্রবালদ্বীপের, আগ্নেয়গিরিগর্ভস্থ শক্তিপুঞ্জের, শশাঙ্ক-কিরণের, সৌর জ্যোতির জীবন এক প্রকার। সেনাপতির জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করা, সেনা চালন করা, ব্যূহ রচনা করা

—অগণ্য মানবজীবন সহজে ও অনায়াসে নাশ করাই তাঁহার জীবন। মহাপ্রাণ ঈশার জীবন, মানব পাপতাপে বিদীর্ণ-হৃদয় হওয়া। শাক্যসিংহের জীবন বাসনার নির্ব্বাণ করিয়া, ক্লান্ত ও পরি-শ্রান্ত জীবকে শীতলহৃদয়ের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া। জীবন নানা প্রকার। কিন্তু প্রকৃত জীবন কি? একটীও ইহার পূর্ণ উত্তর হইল না।

মহাসমুদ্রে বৃহদায়তন তিমি মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক, চক্ষু প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এই প্রকার জল-ক্রীড়াই প্রকৃত জীবন। বসন্ত-সমীরণ, দোলিত বৃক্ষ-লতার নব কিশলয়ের মরমর ঝুরঝুর রাগিণীর মধ্যেই প্রকৃত জীবন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। স্ফীততরঙ্গ অচলভেদী নদপ্রবাহ দম্ভের সহিত বলিলেন, "বহিয়া যাওয়াই জীবন।" কিন্তু মানব-আত্মা সে কথা মানিতে চাহে না। এ প্রকার কালসমাপন করা, "বহিয়া যাওয়া," "নরকে যাওয়া" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দের ভাব প্রকাশ করে।

শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, যে যাহা জানেন, বলিলেন। গণিতবেত্তা, জ্যোতির্ব্বিদ, কবি, দার্শনিক, গায়ক, আত্মীয়, বন্ধু, ধনী নির্ধন, বিজ্ঞ ও মূর্খ আপন আপন জীবনের সংস্করণ দেখাইলেন, মানব-আত্মা বলিতে-ছেন, "উহা নহে।"

বিজ্ঞান (Biology) আরও বলিতেছেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী সত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই জীবন। অথবা, ঐ বন্ধুতা, বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারাই মরণ।

যথা, যতক্ষণ মীন বারির ধর্ম্মে নিজধর্ম্ম মিলাইয়া কাল যাপন করে, ততক্ষণই তাহার জীবন। তাহাতে অপটু হইলেই তাহার মরণ। বারি হইতে উত্তোলন করিয়া ভূমির উপর উহাকে রাখিলে, নবসংচর স্থলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই মৎস্তের মৃত্যু হয়। মানব নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হয় বলিয়াই নিম্নশ্রেণীস্থ জীব হইতে অধিক ক্ষমতাপন্ন এবং উৎকৃষ্ট। যিনি যত অধিক পরিমাণে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তিনি ততই উচ্চ শ্রেণীর; তাঁহার জীবন ততই অধিক মূল্যবান্, বা উচ্চতর। সংসারে যিনি পাঁচজন লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে সক্ষম, তিনি ততই অধিক সাংসারিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ। নচেৎ নানা সদ্‌গুণরাশি থাকিলেও, তিনি অকৃতী লোক বলিয়া সাধারণের চক্ষে বিবেচিত হয়েন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

---

# দ্বারিকানাথ মিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রকৃত লেখা পড়া শিখিয়া কেহ কি কুচরিত্র বা অভদ্র হইতে পারে? যাহা হউক, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাকে আমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করি না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশের শিক্ষায় ভিন্নতা আছে এবং তাহা চিরদিনই থাকিবে। যাহা বিলাতের উপযোগী, এ দেশে তাহা উপযোগী নহে এবং এই দেশের শিক্ষাও বিদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। আমাদের নারীগণ বি, এ, এম, এ পাশ করুন আর নাই করুন, আমি তজ্জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষী নহি, কিন্তু যে শিক্ষায় আমাদের রমণীগণ ধার্ম্মিকা, পতিপরায়ণা, গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা, বুদ্ধিমতী, পুত্র কন্যার শিক্ষয়িত্রী ও জগতের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রবীণা হইতে পারেন, আমি সেই শিক্ষারই পক্ষপাতী; উচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করিবার এখন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। স্ত্রীলোকদিগকে ইতিহাস ও জীবনচরিত সদা সর্ব্বদা পড়িতে দেওয়া ভাল, ইহাই তাহাদের প্রধান পাঠ্য হওয়া উচিত। ইতিহাস ও জীবনচরিত পাঠ করিয়া অবকাশ থাকিলে অন্য বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন। অঙ্কশাস্ত্রে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। জ্যামিতি

বা ত্রিকোণমিতি অথবা জরিপ ইত্যাদির আদৌ প্রয়োজন দেখি না। আইন না জানাই ভাল। শিল্প শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সেলাইয়ের কাজ সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। পাক (রন্ধন) কর্ম্মে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ইহা নিতান্ত আবশ্যক। গাছ পালা আজাই-বার বুদ্ধি ও কৌশল শিখাইয়া দেওয়া ভাল। পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ নিত্যব্যবহারোপযোগী শাক সবজি গৃহের পার্শ্বে আজাইয়া থাকেন, তাহাতে অনেক সুবিধা ও উপকার আছে। ধাত্রী-বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সে কালের স্ত্রীলোকেরা মুখে মুখে বহু প্রকার মুষ্টিযোগ বা টোটকা ঔষধ শিখিয়া রাখিতেন এবং অনেক ঔষধের গাছ গাছড়া চিনিতে পারিতেন, ইহাতে বিশেষ উপকার হইত। এখনকার স্ত্রালোকগণের তাহা শিখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ, সে কাল অপেক্ষা এ কালে রোগের সংখ্যা অধিক ও অসুস্থতার অবস্থা আশঙ্কা-প্রদায়িনী। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও দ্রব্য-গুণ-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতেই হইবে, নতুবা গৃহস্থ কখন নীরোগ ও সুখী হইতে পারিবেন না। আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত স্ত্রীলোকগণের সুন্দর পাঠ্য পুস্তক। কৃত্তিবাস ও কাশী-রাম দাস এতদ্দেশীয় রমণীগণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এইদুইটি প্রসিদ্ধ কবির কাব্য বর্ত্তমান না থাকিলে এদেশে নারীসমাজ কেন, পুরুষসমাজ পর্য্যন্ত বহু শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। বাঙ্গালীসমাজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের নিকট এত ঋণী যে, সেই ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দ্বারিকানাথ মিত্র কহিলেন, —"পাশ্চাত্যদেশে যে ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, প্রাচ্য দেশে সে ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা কখন চলিবে না ও চলিতে পারে না। জল, বায়ু, প্রকৃতি, সমাজ, প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথার সৃষ্টি হয়। অধিক কি, মাদ্রাজ, বোম্বাই, রাজপুতানা দেশের নারীসমাজ এবং বাঙ্গালা দেশের নারী-সমাজ কখন এক হইতে পারে না। যাহা হউক, আমি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় স্বাধীনতা দিতে সম্মত নহি। এরূপ স্বাধীনতা দিবার সময় এখনও আসে নাই এবং কখনও আসিবে না ইহা নিশ্চয়। অতি প্রাচীন মনুর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীসমাজ পুরুষের বশীভূত আছে এবং চিরদিন থাকিবে ইহা নিশ্চয়। প্রাচ্য দেশের (Oriental countries) সমাজ-প্রথা চিরদিনই প্রাচ্যোপযোগিনী থাকিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কলিকাতা নগরীতে উচ্চ-জাতীয় হিন্দুর স্ত্রীলোকগণ অবশ্য একটু নিতান্ত পর্দ্দানশীনী ভাবে থাকেন, কিন্তু মফস্বলে(পল্লীগ্রামে) স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনা। সেখানে অনেকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক

একত্র বাস করে, এপাড়া হইতে ওপাড়ায় স্ত্রীলোকেরা গমনাগমন করে, গৃহস্থ হইতে গৃহস্থান্তরে তাহারা যায়, পুকুর, ঘাট, মাঠ প্রভৃতিতে যাতায়াত করিতে পায়, সুতরাং পরাধীনতা বুঝে না এবং বুঝিতে পারে না, অথচ উচ্চজাতীয় স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দা-নশিনী ভাবকেও রক্ষা করেন এবং নারী-দিগের স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখেন। পল্লীগ্রামে, স্ত্রীলোক নষ্ট হইবার উপায় কম, কারণ তথায় পাপ ও প্রলোভন কম, কলিকাতায় প্রতারণা, পাপ, প্রলোভন ও অধার্ম্মিকতার বাহুল্য। পল্লীগ্রামে নর ও নারী-সমাজে যে সহানুভূতি থাকে, কলিকাতায় তাহা থাকে না; কলিকাতা নগরীতে এ ঘরের লোক ওঘরের লোককে চিনে না। দেওয়ালের সংলগ্ন বাটীতে দশ জন লোক মরিয়া গেলে অথবা দশ হাজার টাকা ব্যয়ে কোন সমারোহ হইলেও প্রতিবাসী তাহার খোজ লয় না এবং কোন সমাচারই জানিতে পারে না বা পায় না। কলিকাতায় সহানুভূতি নাই, সদ্ভাব নাই, একত্র বাসের সুখ নাই, এবং পরস্পর মিলন নাই। এখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অসুখী।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় যখন হাইকোর্টের জজিয়তী করিতেন, তখন কোন হিন্দু বন্ধুর অনুরোধে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে গিয়া এক দিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের লোকেরা যখন শুনিল, হাইকোর্টের জজ দ্বারিকানাথবাবু আসিতেছেন, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। বন্ধুকে মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত লোক আসিয়াছে কেন?" বন্ধু কহিলেন,—"আপনাকে ইহারা দেখিতে আসিয়াছে।" দ্বারিকানাথ ঐ সকল লোকের সম্মুখে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলি-লেন,—"আপনারা এ অধমকে দেখিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন কেন?" কয়েকজন প্রধান লোক কহিলেন,—"আপনি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ, আপনাকে দর্শন করিলেও পুণ্য হয়, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" দ্বারিকানাথ বলিলেন,—"আমি অতি সামান্য লোক, আমি সর্ব্বসাধারণের সেবক ও ভৃত্যমাত্র। হাইকোর্টের জজিয়তী করা একটা বড় কথা বা বড় কাজ নয়, ইহা সৌভাগ্যের কথা নয়, বরং নানা কারণে দুর্ভাগ্যেরই কথা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় ও ভক্তি করে এবং পরোপকার করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই ধন্য এবং সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান্।" (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

## ক্ষুব্ধা।

হয় তো বা স্নেহময়ি! ফুরাইছে সব,
সাধের বাঁশরী বীণা হতেছে নীরব;
যেখানে রয়েছ যত আপনার জন,
প্রণতি আশীষ স্নেহ করিও গ্রহণ।

জানি না তোমার মন মা বিশ্বজননি!
যা হয় করিও, আমি কিছুই চাহিনি;
হয় র'ব নহে য'াব, তাহে নাহি ডরি,
বাকি যে অনেক আছে সেই ক্ষোভে মরি।

শ্রীবীরকুমারবধ রচয়িত্রী।

---

## আহ্বান।

আমি যে চাহি হে জীবনস্বামী!
তোমারে ধরিয়া থাকিতে;
আমি যে চাহি সারা নিশি দিন,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।

তুমি যে সদা নিমেষের তরে,
দেখা দিয়ে যাও চলিয়া;
কত যে খুঁজি নাহি পাই দেখা,
আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া।

শূন্য হৃদয় হের যদি মোর
পূর্ণ কর প্রেমসুধায়;
নির্ম্মল কর মলিন মরম
তোমার মঙ্গল আভায়।

মঙ্গল-গীতি হউক ধ্বনিত
হৃদয়তন্ত্রী মথিয়া;
হীন জড়িমা দূরে যাক চলে,
পান করি নাম-অমিয়া।

মহিমাময় তব নাম পানে
উঠুক চিত্ত ভরিয়া;
দাসানুদাসে তোল গো গড়িয়া
তোমার করুণা সিঞ্চিয়া।

শ্রীমঞ্জুরোল।

---

## পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। পালা জ্বর—পালার দিন সকালে মুখ ধুইয়া একটী পানের সহিত থুলকুঁড়ীর (থানকুনীর) মূল ও শিকড় চিবাইয়া খাইলে আর জ্বর হইবে না।

২। বালকের সর্দ্দিজ্বর—তুলসীপাতার রস শামুকের ভিতর পুরিয়া গরম করিয়া মধুর সহিত সকালে ও সন্ধ্যায় ২বার খাওয়াইলে সর্দ্দিজ্বর দূর হইবে।

৩। মাথা বেদনা—কাঁচা সুপারি পানের সহিত অধিক মাত্রায় খাইলে মাথা-বেদনা দূর হয়।

৪। আদকপালে মাথাধরা—থুলকুঁড়ী-

পাতা ( থানকুনিপাতা ) লবঙ্গের সহিত পিষিয়া যে দিকে বেদনা ঐ দিকে প্রলেপ দিবে।

৫। যে দিকের মাথাব্যথা হইবে, সেই দিকের বাহুতে গামছা আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সত্বর মাথাব্যথা দূর হইবে।

৬। বসন্ত না হইবার ঔষধ—শ্বেত পুনর্ণবার মূল ॥০অর্দ্ধতোলা পাঁচটী গোলমরীচ সহ বাটিয়া জলসহ খাইলে ১বৎসরের মধ্যে বসন্ত হইবে না।

৭। আমাশয়—আফুলা মানকচুর শিকড় ঘোলের সহিত বাটিয়া ২।৩ দিন খাইলে আমাশয় ভাল হয়।

---

# নূতন সংবাদ।

১। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড ক্রু ( Crew ) ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিবেন, এরূপ শুনা যাইতেছে।

২। এডমিরাল্‌টী আইল্যাণ্ডের রাক্ষসেরা একখানি নৌকা ধরিয়াছিল। তিন জন ইংরাজ ও তিন জন চিনাম্যান তাহাতে ছিল। তাহারা পাঁচজনকে খাইয়া ফেলিয়া দেয়। কেবল মাত্র একজন ইংরাজ তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, এখনও এইরূপ রাক্ষস বর্ত্তমান আছে।

৩। বহরমপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঋণ হওয়ায় মহারাজ বাহাদুর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর এই মহাত্মাকে দীর্ঘজীবী করুন।

৪। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, জজ কেদারনাথ রায় হাজারীবাগে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছেন। আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় ইঁহারই সহধর্ম্মিণী। ইনি অতি সদাশয় ও মহৎ লোক ছিলেন। ঈশ্বর ইঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন ও ইঁহার শোকার্ত্ত পত্নী ও পুত্র কন্যাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৫। ৪ঠা নবেম্বর মিরাটের নিউ জেনারেল হস্‌পিটালের ভিত্তি সার্ জন হিউট কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাধারণে ১১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। কারজ্যান নামক জনৈক বেলুন-চালক সম্প্রতি ঘোরমেলনে ৪ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ডে ৯৪৪ মাইল উঠিয়াছিলেন। এত উচ্চ এ পর্য্যন্ত আর কেহ উঠিতে সক্ষম হয়েন নাই।

৭। শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের ঘোষণাপত্র প্রচারের দিন ১৫ই নবেম্বর তারিখে আমাদের বড় লাট বাহাদুর নির্ব্বাসিতগণকে মুক্তি দিবেন এরূপ জনশ্রুতি উঠিয়াছিল। আবার শুনা যাইতেছে যে, আগামী জানুয়ারী মাসে নূতন ব্যবস্থাপক

সভার অধিবেশনের এবং পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৮। রাণীগঞ্জের টালি খোলা অতি সুন্দর ও সুদৃঢ়। এইরূপ খোলা যশোরের অন্তঃপাতী কালিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের কুম্ভকারগণ প্রস্তুত করিতেছে। রাণীগঞ্জের খোলা অপেক্ষা যশোরের খোলা সুলভ।

৯। সম্প্রতি জয়পুরের পুণ্যশ্লোকা প্রাচীনা মহারাণী ভৌতিক কলেবর পরিহারপূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, দয়া ও দান অতুলনীয়। সমস্ত রাজপরিবার ও প্রজাবর্গ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিত। জয়পুর মহারাজের ইংলণ্ডবাসকালে রাজসভার মন্ত্রী ও সদস্যেরা রাজ্যতন্ত্রবিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। গুরুতর কঠিন বিষয় সকলের তিনি সহজে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। এ স্থলে কয়েকটীমাত্র উল্লিখিত হইতেছে,— ভূতপূর্ব্ব দিল্লীদরবারকালে, দুর্ভিক্ষফণ্ডে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া এককালে লক্ষ মুদ্রা দান করেন। প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের ভারতাগমনকালে তদীয় সম্মানার্থ দরিদ্রভাণ্ডারে লক্ষ মুদ্রা দান করেন। মেয়োকলেজে বিশ হাজার টাকা, আজমির কলেজে দশ হাজার টাকা, লেডি মিণ্টোর স্থাপিত ধাত্রীশিক্ষাকার্য্যে দশ হাজার টাকা, স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুমোদিত দাতব্যভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা, ব্রিটিশ্ হাঁসপাতালে পঞ্চাশ হাজার টাকা, অনাথা বিধবা ও বালিকাদিগের জন্য লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা, লণ্ডন হাঁসপাতালে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এইরূপ অসংখ্য সৎকার্য্যে তিনি যে কত অর্থ দান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দানধর্ম্মে ও সতীত্বে এ জগতে ভারতরমণীরাই অগ্রগণ্যা ছিলেন। বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার অপভ্রংশে একালে স্বার্থপরতা ও বিলাসিতার প্রসার যতই বাড়িতেছে, ধর্ম্মপ্রাণতা ও দয়া ততই অদৃশ্য হইতেছে।

---

## পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। 'জীবন'—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ-প্রণীত। কলিকাতা ৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। ক্ষুদ্র পুস্তক, ছাপা পরিষ্কার। পুস্তক আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, গুণে অতি মহৎ। এ পুস্তক পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি। "শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে,"—সকল পর্ব্বতে মানিক মিলে না, গজমুক্তাও সকল করিকুম্ভে মিলে না। রত্ন চিরকালই দুর্লভ। এরূপ পুস্তকের লেখকও দুর্লভ।

যিনি একটু ধৈর্য্য ও সময় ব্যয় করিয়া ইহা অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি জীবনের অনশ্বরতা বুঝিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন এবং জীবনের উপযোগিতা বুঝিয়া লাভবান্ হইবেন। এরূপ গ্রন্থের অনুশীলন দ্বারা মানব আত্মজ্ঞানে সমুন্নত হয়। ইহার ভাষাটুকু যেমন সরল, তেমনি প্রাণস্পর্শী।

২। আর্য্যনারী—"ভারতচিত্র"-গ্রন্থাবলীর ২য় সংখ্যা। 'ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্' কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা স্বদেশের ও মাতৃভাষার অমূল্য সম্পত্তি। এই ২য় সংখ্যায় চতুর্ব্বিংশতি অতুলনা ভারতললনার অমৃততুল্য জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই সরল ও প্রাঞ্জল। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়ার পুণ্যময়ী কাহিনী পাঠ করিলে, জীবন ধৃতপাপ হয়। স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য, দীনসেবার জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য এবং সর্ব্বোপরি সতীত্বরক্ষার জন্য, ভারতরমণীরা কিছুদিন পূর্ব্বে যে বীর্য্য, যে মহত্ব, যে আত্মত্যাগ দেখাইয়াছেন, জগতে অতুলনীয় সেই সকল অলৌকিক চরিত্র ইহাতে বিশদরূপে চিত্রিত। এই পুস্তকাবলী দ্বারা স্বদেশ ও মাতৃভাষা মহোপকৃত।

---

# বামারচনা।

## সতীত্ব।

পরম পবিত্র ইহা দ্যুলোকের দান,
অনন্ত আনন্দময় স্বর্গের সমান।
অনন্তের শক্তি এ যে জ্বলে অনুক্ষণ,
মিলনে ময়ূখ মালা মলিন দর্শন।
আদি-অন্তহীন নিধি অব্যক্ত অশ্রুত,
জীবনে আলোক ঢালে মরণে অমৃত।
সাধ্বীর হৃদয় এক সুমহান্ খনি,
তাহাতে নিহিত এই মহামূল্য-মণি।
যে নারী এ রতনের পূর্ব্বাধিকারিণী,
সেই সে জীবন্ত স্বর্গ ব্রহ্মাণ্ডে বন্দিনী।
কে জানে কোথায় স্বর্গ কি আছে সেথায়,
কে জানে দেবতা ধাতা আছে কিনা তায়?
সাধ্বী রমণীর পদ পঙ্কজ কোমল,
পরশনে হয় শত স্বরগের ফল।
সতীত্ব লভিয়া শচী ত্রিদীবের রাণী,
সতী বলে উমা ভবে জগতবন্দিনী,
পদ্মিনী সতীত্ববলে জিনিয়া মরণ,
আজিও ভারতে আছে জীবিতা যেমন।
গান্ধারী কৌশল্যা পতিব্রতা নারীগণ,
সতীত্বের রশ্মিজালে বেড়েছে ভুবন।
রুগ্নপ্রায় ভগ্নদেহ, অসার ভারত,
আজিও জীবিত আছে লভি এ সম্পদ,
সতীত্বের স্নিগ্ধ আলো রবে যত দিন'
ততদিন জন্ম-ভূমি হবে না মলিন।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

## সাগরতীরে।

ছিদ্রশূন্য কাল নীরদরাশিতে
নীল নভস্তল ফেলেছে ঢাকি,
ভীতিকর নানা সুচিক্কণক
কে যেন আকাশে রেখেছে আঁকি।
মসীময়ী নিশা, আঁধার আঁধার,
একটি তারকা না যায় দেখা।
প্রলয় করিবে প্রকৃতি বুঝিবা—
জ্বলেছে তাহার ক্রোধের শিখা।
ঝলকে বিদ্যুৎ ধাঁধিয়া পৃথিবী,
সাগর খেলিছে সমরখেলা
হুঙ্কারি বুঝিবা গ্রাসিবে ধরণী
ছুটিছে ফেনিল তরঙ্গমালা।
সহস্র বিপদ্ ফেলিয়া পশ্চাতে
ঈশ্বরের নাম লইয়ে ধীরে,
এমন সময় কে তোমরা দোঁহে
আসিয়ে দাঁড়ালে সাগরতীরে।
বিবর্ণ বদন, অবশ নয়ন,
খসিয়া পড়িছে শিথিল বাস,
কম্পিত হৃদয়, শক্তিহীন দেহ,
বহিছে দোঁহার সঘন শ্বাস।
একটি যুবক মস্তকে উষ্ণীষ,
বীরোচিত দেহ কটিতে অসি,
অন্যটী যুবতী লাবণ্যমণ্ডিতা,
যেন পূর্ণিমার সোণার শশী।
ভীতা কুরঙ্গিণী আকুল নিশ্বাসে
সভয়ে যেরূপ তাকায় পাশে
ক্ষিপ্ত সিন্ধুপানে চাহিয়ে তেমনি
সখার পানে সে চাহিল ত্রাসে।
কত ভালবাসা উছলি উঠিল
জলভরা সেই নয়নকোণে,
সে ঘোর আঁধারে দেখিল না কেহ,
মিশিল আপনি আঁখির সনে।
যুবক আপন হাতখানি দিয়া
জড়ায়ে রেখেছে সে দেহলতা,
এমনি করিয়া হৃদি পরে যেন
চিরকাল তারে রাখিবে গাঁথা।
বালাও কোমল হাতখানি দিয়া
ধরেছে সখারে সুদৃঢ়ভাবে,
ছাড়িবে না যেন জীবনে মরণে
এমনি করিয়া নিকটে রবে।
যুবক কহিল ধীরে বিকম্পিত স্বরে—
আছ কি নাবিক কেহ এ ঘোর দুর্যোগে?
আছে কি তরণী কোন সাগরের তীরে,
নিরাপদ স্থানে লয়ে যেতে আমাদিগে?
একি ঈশ্বরের লীলা! এমন সময়
বলিল কে যেন ডাকি সেই স্নেহপূর্ণ স্বরে,
কে তোমরা? তোমাদের নাই কি আশ্রয়?
এ সময় আসিয়াছ সাগরের তীরে?
"আমি হই একজন অভাগা নাবিক,
সম্বল আমার ভগ্ন একখানি তরী,
নাহি মোর কন্যা, পত্নী, পুত্র প্রাণাধিক,
বাসস্থান সিন্ধুতীর নাহি ঘর বাড়ী!
এমন সময় তাই সাগরসৈকতে
দাঁড়ায়ে দেখিতেছিনু তরঙ্গের খেলা,
তুমিও কি মোর সম অভাগা জগতে,
সয়েছ জীবনে শত ঘৃণা অবহেলা?
"রাজার কুমার আমি কিন্তু ভাগ্যহীন,
সঙ্গে মম একজন নৃপতিদুহিতা,
পথশ্রমে নিপীড়িতা, বিমর্ষ মলিন,
রৌদ্রতাপে ম্লান যথা কুসুমিত লতা।

"হয়েছিল আমাদের গোপন প্রণয়,
লভেছিনু কুমারীর প্রেম ভালবাসা,
সঁপেছিনু হাতে তার সমস্ত হৃদয়,
জীবনের সুখ আর ভবিষ্যৎ আশা।
"আমি নৃপতির বৈরী"—গুপ্তচর-মুখে
শুনি তাহাদের এই প্রণয়বারতা,
জ্বলিল ভীষণ অগ্নি নৃপতির বুকে,
সমাধি লভিল যত আদর মমতা।
নাশিতে আমারে আর তনয়ারে তাঁর
স্থিরকল্প হইলেন, প্রাণপ্রতিমায়
নিষ্ঠুরের হস্ত হতে করিতে উদ্ধার
এসেছে এ হতভাগ্য সাগর বেলায়।
"হেরি কুমারীর মুখ সজলনয়ন,
দ্বারপাল দ্বার ছাড়ি পুত্তলিকাবৎ
দাঁড়াইল এক পাশে বিবর্ণ বদন,
বিদ্যুৎ প্রদানি আলো দেখাইল পথ।
"পশ্চাতে আসিছে নৃপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে,
ভগ্ন তরীখানি তব দাও একবার"।
"শত ছিদ্র সে তরণী ভাসাইলে নীরে
এখনি করিবে গ্রাস ক্ষিপ্ত পারাবার।"
"সেও ভাল ক্রুদ্ধ নৃপ মহাযুগাভরে
এখনি হানিবে অস্ত্র বুকের উপর,
অসহ্য তা—দুইজনে চির জন্ম তরে
লভিব সাগরতলে সমাধি সুন্দর।"
"এস তবে পিপাসিত প্রেমিক যুগল
এনেছ কি সাথে কিছু গুরু বস্তু তব?
পরিত্যাগ কর তাহা হও নিঃসম্বল,
উঃ কি ভীষণ বেশে সেজেছে অর্ণব।"
প্রথম সাক্ষাৎ যবে কুমারীর সনে,
চুম্বিয়া সোহাগভরে ঠোঁটখানি তার
ধরিয়া সে হাত দুটী স্নেহ পরশনে
দিয়েছিনু একটুকু প্রেম উপহার—
একশিশি "কুন্তলীন" সেও প্রেমভরে
রেখেছিল বক্ষপর, এখনো গোপনে
লুকায়ে এনেছে তাহা বক্ষের ভিতরে,
রাখিবে হৃদয়ে নাকি জীবনে মরণে।
বাহুতে রয়েছে তার দু'গাছি বলয়,
দুইটী কুণ্ডল শোভে শ্রবণে তাহার,
নাসাতে নোলক এক চিরশোভাময়
কণ্ঠে শোভে এক ছড়া মাণিময় হার।
"আর কোনরূপ দ্রব্য নাহি কাছে মোর,
কেবল আমরা আছি দুই জন প্রাণী,
শীঘ্র আরোহণ কর তরণী উপর,
ঐ শুন শোনা যায় অশ্বপদধ্বনি"।
উঠিল তিনটী প্রাণী ভগ্ন তরী পরে
আস্ফালি উঠিল সিন্ধু সেনাগণ লয়ে,
উপনীত হোল নৃপ সাগরের তীরে,
দামিনী উঠিল হাসি দিক্‌ আলোকিয়ে।
সে ক্ষীণ আলোকে চাহি দেখিল নৃপতি,
ভীষণ সাগরবক্ষ ফেনপুঞ্জে ভরা,
ছুটিছে তরঙ্গমালা ভীষণ আকৃতি,
তারি মাঝে নৃপতির নয়নের তারা।
আর না সহিল প্রাণে, শত নিষ্ঠুরতা
ভেদ করি উছলিল স্নেহের নির্ঝর,
ডাকিল চিৎকারি, "অয়ি প্রাণের দুহিতা!
ফিরে আয় আমার এ বক্ষের ভিতর!
"ভীষণ তরঙ্গকুল ক্ষিপ্ত পারাবার,
ফিরে আয়, আয় মোর স্নেহের প্রতিমা!
করেছ যা অপরাধ নিকটে আমার
সর্ব্বান্তঃকরণে আমি করিলাম ক্ষমা।"
কেহ না উত্তর দিল, হো হো করিয়া
হাসিয়া উঠিল শুধু পাগল বাতাস,

সাগর জীমূতমন্দ্রে উঠিল গর্জ্জিয়া,
ডাকিয়া উঠিল মেঘ ভাঙ্গিয়া আকাশ।
চপলা হাসিল পুনঃ সাগ্রহ নয়নে,
শূন্য সিন্ধুবক্ষে নৃপ চাহিল আবার,
সবি কি মিশিয়ে গেছে লহরীর সনে ?
অহো! কি নিষ্ঠুর তুমি মহা পারাবার!

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

---

## জন্মদিনে।

১

সুষুপ্তা যামিনীকোলে,
অতি সাবধানে খুলে,
বিধাতার কোন্ গুপ্ত দ্বার ?
মন্দারসৌরভময়ি!
সারল্যে আনন ঢাকি
চলে এলি বিশ্বের মাঝার।

২

নিমীলিত দুটী আঁখি,
কাঁদিতেছ থাকি থাকি,
বল্ বল্ তুই কোথাকার ?
আধ আধ ওঙ্কারবে,
আকুল করিলি সবে,
উথলিছে হিয়া বার বার।

৩

সুশুভ্র যামিনীভালে
শতেক তারকা দোলে,
তুই কিরে একটী তাহার ?
সচেতন ফুল হয়ে,
মন্দার-সৌরভ লয়ে,
ফুটিলি এ বিশ্বের মাঝার ?

৪

মঙ্গল আলয় হতে
শোকতপ্ত সংসারেতে,
এলি যদি সাধনার ধন,
মরুময় হৃদিদেশে
কোমল মধুর হেসে
ঢেলে দেরে শান্তি প্রস্রবণ। ৫
ক্লান্ত হয়ে দেবস্নেহে
জননিজি হীন গেহে
উথলিয়া হৃদয় কানন।
কচি শিশু! মার বুকে
আশার কিরণ মেখে
থাক্ ফুটে ফুলের মতন।

৬

(আজ) তোর শুভ আগমনে
(আজ) তোর শুভ জন্মদিনে
আমি তোরে কি দিবরে বল্,
বিধির করুণাগুণে
বাড় তুমি দিনে দিনে,
দেখে হোক্ নয়ন সফল!!

আশীর্ব্বাদিকা—পিসিমা
শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

২১।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 556. December, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৬ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। ডিসেম্বর, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।



## সাময়িক প্রসঙ্গ।

ছাত্রগণের ধর্ম্মপ্রাণতা।—কাশী-ধামে এনি বেসান্তের স্থাপিত সেন্ট্রাল্ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া সকলে শপথপূর্ব্বক চা-পান পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং চা পানের জন্য যাহা ব্যয় হইত, সকলে সেই অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক, কৃষক, মজুর প্রভৃতির শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ছাত্র প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া এই শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকেন। ছাত্রগণ দুর্গাপূজার অবকাশ বৃথা নষ্ট না করিয়া, সে সময় নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক এ সকল সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। বলিতে কি, ছাত্রেরাই আমাদের দেশের আশা ভরসা। ছাত্রগণের সৎপথে মতি গতি দেখিলে, হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়।

প্রাচীনতম কৃত্তি-কীর্ত্তির আবিষ্কার—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনীষিগণের চেষ্টায় সম্প্রতি ভারতবর্ষ, পারস্য, সীরিয়া, বাবিলোনিয়া, গ্রীস, সীদিয়া প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যজাতির নানাবিধ ভাস্কর ও স্থাপত্যাদিবিষয়ক কীর্ত্তিচিহ্ন সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। সে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন দর্শন করিলে এ সকল প্রাচীনজাতি ভাস্কর-স্থাপত্যাদি নানা বিদ্যায় কিরূপ সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া অবাক্ ও স্তম্ভিত হইতে হয়। "Temple of Foreigners at Memphis, the Ancient Capital"—নামক স্থানে, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ভূরি ভূরি কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা এই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া, জগতে তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ইতিহাসের ভূরি ভূরি নব নব তত্ত্ব উপাদান উদ্ঘাটনপূর্ব্বক মানবসমাজের মহোপকার সাধন করিবেন,

সন্দেহ নাই। মিসর (Egypt) দেশের জল-বায়ু ও মৃত্তিকার একটী আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, তথায় সহস্র শতাব্দীতেও কোনও বস্তু ক্ষয় বা বিকার প্রাপ্ত হয় না।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের মাতৃভূমির মহারত্ন মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত আর ইহলোকে নাই! ৩০শে নবেম্বর বেলা ২টার সময় বরদায় এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডে থাকিয়া সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের অধীনে যথাক্রমে প্রাদেশিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিসনার প্রভৃতি অত্যুচ্চ রাজকীয় পদে অতীব সুখ্যাতির সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শেষে বরদারাজ্যের প্রধান সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বে ও চেষ্টায় বরদারাজ্য আজি ভারতে আদর্শ রাজ্যরূপে খ্যাত। কি শিক্ষা বিভাগে কি অন্যান্য বিভাগে তিনি বরদায় উন্নতির যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যিনি একটীবার তাঁহার সঙ্গে ক্ষণমাত্রও আলাপ করিতেন, তিনি যাবজ্জীবন তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। বিদ্যা, বিনয় প্রতিভা ও ধর্ম্মপ্রাণতার একাধারে এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ এ জগতে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত দত্তবংশের অবতংস। দীর্ঘকাল ইংলণ্ডবাস ও ইংরাজজাতির সহ ঘনিষ্ঠতা করিয়াও ইনি বিশুদ্ধ দেশীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। বিলাতে কিছুদিন বাস করিয়া অনেকে মাতৃভাষায় হতাদর হন, কিন্তু মাতৃভক্ত রমেশ মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার সুপুত্রাগ্রণী। বঙ্গভাষায় গ্রন্থকারগণের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চ। হা হতভাগিনি! বঙ্গভূমি! তুমি তোমার সার পুত্ররত্ন হারাইলে! শোকে ও অশ্রুধারায় প্রাণ ও নয়ন আকুলিত, আর কিছুই লিখিতে পারিলাম না। বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই বিশ্বজনীন মহাত্মার তিরোভাব যে, ভারতে সর্ব্বজাতির সর্ব্বসম্প্রদায়ের মহতী ক্ষতি, এবং এ ক্ষতির যে আর পূরণের আশা নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মঙ্গলময় জগদীশ এ দুর্লভ মহাত্মার আত্মাকে তাঁহার অনন্ত শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

হে মহাত্মন্! তোমার পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে লয় পাইলেও, তোমার অকলঙ্ক অপার্থিব কীর্ত্তিময় দেহ অনন্তকাল লোক-হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

ব্যাঘ্রভীতি। ইদানীং নানা স্থান হইতে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের সংবাদ শুনা যাইতেছে। বর্ষে বর্ষে ব্যাঘ্রহস্তে লোকহত্যার তালিকা দেখিলে চমকিত হইতে হয়। আগ্নেয়াস্ত্রই ব্যাঘ্রসংহারের মুখ্য সাধন। কিন্তু রাজবিধানে প্রজা সে উপায়ে বঞ্চিত। এজন্য ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিরা স্বচ্ছন্দে স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল, হুগলি জেলার নন্দনপাড়ার নিকট সাবালা সিংপুর নামক গ্রামে এক ব্যাঘ্র একাদিক্রমে ছয়জনকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে দুইজন হত ও চারিজন আহত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পতিত। গ্রামবাসীরা

মহাভীত। কাহারও নিকট আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় প্রতীকারচেষ্টা অসম্ভব। এ সকল স্থানে সুদক্ষ শীকারী নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।"

নদীয়া জেলায় শিল্পের দুরবস্থা—ব্যারিষ্টার মিষ্টার এ, সি. বানার্জ্জি নদীয়া কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়া তাঁহার সুবিস্তৃত বক্তৃতায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

এক সময়ে এই নদীয়া জেলা চিনি, বস্ত্র, ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য প্রভৃতির জন্য বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ঐশ্বর্য্যশালী স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন সেই সকল শিল্পের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে এবং যাহা আছে, তাহাও লোপ পাইতেছে। যদি এ দেশের এই শিল্পরক্ষার জন্য সকলে যথোচিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অচিরে লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার হইয়া পুনরায় এ দেশ ঐশ্বর্য্যশালী ও দেশবাসীর দুঃখ দূর হইবে। আশা করি, এ বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

---

## সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

পূর্ব্বে এদেশের প্রায় প্রতিগৃহে, দৈনিক কার্য্যের বিরামে, আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত পরিবার, জ্ঞানবৃদ্ধ পিতৃপিতামহাদি গুরুজনের নিকট বসিয়া, হরিশ্চন্দ্র, নল, যুধিষ্ঠির, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্ম, অর্জ্জুন কর্ণ, প্রভৃতি স্বদেশীয় পুণ্যশ্লোকগণের, এবং সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা, বিহুলা, প্রমলা, শৈব্যা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, সুমিত্রা প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকাগণের চরিত্র তন্ময়চিত্তে শ্রবণ করিত। শিক্ষণীয় শিশুগণের হৃদয়ে, ঐ সকল কৌতুকাবহ, পদে পদে বিস্ময়োদ্দীপক, লোকপাবন চরিত্রের প্রভাব শনৈঃ শনৈঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইত, এবং অলক্ষ্যভাবে তাহাদের জীবনস্রোতকে শাশ্বত শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত করিত। গুরুভক্তি, দয়া, মৈত্রী, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, সংযম, সতীত্ব, পুণ্যশীলতা প্রভৃতি দৈবভাবসকল শ্রোতৃগণের কোমল হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিত। গুরুজনের প্রতি অবাধ্যতা দূরে থাক, বালক-বালিকারা প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গুরুজনের আজ্ঞা "অহম্পূর্ব্বমহম্পূর্ব্বম্"ভাবে পালন করিত। যে বালক স্বগৃহেই প্রচুর আমোদ পায়, আমোদের জন্য সে কেন বহির্ম্মুখ হইবে? "গৃহে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"—স্বগৃহেই যদি মধুভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকে, তবে মধুর জন্য কে পর্ব্বতে গমন করে?

সে গুরুজনের অভাবেই বর্ত্তমান সমাজের নানা দুর্গতি ঘটিতেছে।

অধিকাংশ পিতা মাতা সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যালয়ের পুস্তক বেতনাদি দিয়াই নিশ্চিন্ত। বালকেরা নানা ছলে মাতাপিতার নিকট পয়সা আদায় করে। তাঁহারা পয়সা দিয়াই নিশ্চিন্ত। সে পয়সা লইয়া বালকেরা কি করে? সে সংবাদ অনেকেই রাখেন না নিজ সন্তানেরা কিরূপ চরিত্রের সমবয়স্কের সংসর্গ করে, সে দিকেও অনেকের দৃষ্টি নাই। এ সকল অনবধানতার যেরূপ বিষময় ফল হওয়া উচিত,তাহাই হইতেছে। এখনকার অজাতশ্মশ্রু ছাত্রেরা, অধ্যয়নে উপেক্ষা করিয়া, অবাধে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি, প্রবীণ আচার্য্যগণেরও দুর্ব্বোধ উচ্চ উচ্চ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে। অধিকতর পরিতাপের বিষয়, তাহাদের প্রবীণ গুরুজনেরা এ সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেছেন। "শিষ্যস্যাধ্যয়নং তপঃ"—অধ্যয়নই ছাত্রের অদ্বৈত সাধনা, এ সনাতন ঋষিবাক্য, বোধ হয়, তাঁহাদের নিকট অপরিচিত।

যে শিশুজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর সমস্ত দেশের আশা ভরসা, যাহাদের শিক্ষা ও সঙ্গাদির উপর সমস্ত সমাজের শুভাশুভ, তৎপ্রতি গুরুজনের কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত, বালকগণের নিরাময়, অখণ্ড সাধুজীবন গঠনের জন্য, রাজা, প্রজা, সকলেরি সমবেতভাবে কিরূপ কঠোর সাধনা আবশ্যক, তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক্ ব্যক্ত করা অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগের যাহা কিছু দুর্নিমিত্ত বা দুর্ঘটনা, সে সমস্তই শিক্ষাবিকারের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণজন্য কঠোর দণ্ডের প্রয়োগ নিষ্ফল। রোগীর আভ্যন্তরিক রোগে তাহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালাময় বিলিষ্টার লেপন, রোগেরই উত্তেজক। এজন্য, বহির্ম্মুখী শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংশোধন আবশ্যক। এ কার্য্য রাজা, প্রজা, উভয়ের সমপ্রাণতা ও সমবেত সাধনা ভিন্ন সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

"যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি
একমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে॥"
—যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড ল'য়ে কুম্ভকার—
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার,
তেমতি করিয়া লোক আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়।
"যাত্যধোঽধোব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্য চ কারকঃ॥"
—কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে হয় মহোন্নতি,
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীরগঠক।

স্বভাবতঃ সরল ও কোমল শিশুচিত্ত, সরস মৃৎপিণ্ডের ন্যায়। কর্ত্তার ইচ্ছামত মৃৎপিণ্ডে যেমন শিব ও শাখামৃগ, উভয়ই গঠিত হইতে পারে, শিশুজীবনকেও তেমনি ইচ্ছামত গঠন করা যায়। শিক্ষার্থীর শিশুর ঘরে বাহিরে সকল দিকে কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্তরূপ দূষিত পদার্থের দূরীকরণই শিশুশিক্ষার মঙ্গলাচরণ। এই

জন্যই এদেশের পূর্ব্বতন আর্য্যগণ, জনকল্লোল হইতে পৃথক্ স্থানে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিক্ষণীয় বালককে, শিক্ষাসমাপ্তি পর্য্যন্ত, কঠোর সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক, গুরুকুলে বাস করিতে হইত। আচার্য্যগণের আশ্রমসকল, নির্ম্মলপবনবীজিত, সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, দ্বেষহিংসাদিপরিশূন্য স্থানেই নির্ম্মিত হইত। তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর পবিত্রতা অনির্ব্বচনীয়। ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও তথায় প্রবেশমাত্র বলিয়া উঠিত,—আহা! কি শান্তিরসের স্থান! এ স্থানের চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্, প্রতি পদার্থ হইতে যেন অপূর্ব্ব ভক্তি, করুণা ও শান্তি উচ্ছ্বসিত হইতেছে! এ স্থানে আসিলে অতি বড় পাষণ্ডকেও আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হইতে হয়।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃপিতামহ ও আচার্য্যগণ বলিতেন,—"আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা, পথে পথে গুরুমুখ হইতে লব্ধ। ছাত্রপালনের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য গুরুকে পদব্রজে দূরদেশে গমনাগমন করিতে হইত। সে সময় একমাত্র ছাত্রই তাঁহার তল্পীবাহক, ভৃত্য, পাচক, সখা ও সঙ্গী। নানা গ্রাম, পল্লী, বনমার্গ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি বিচিত্র স্থানসকল দিয়া গমনকালে, গুরুদেব ঐ সকল নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীবিষয়ে নানা প্রশ্ন ও নানা তত্ত্বের উত্থাপন করিতেন, এবং অতি সুন্দররূপে সে সকলের মীমাংসা করিতেন। ঐ সকল কথায় তন্ময় হইয়া আমরা পথশ্রমের নামগন্ধও অনুভব করিতাম না। বলিতে কি, আমরা পথে পথে মুখে মুখেই অধিকাংশ জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং সে সকল অমূল্য শিক্ষা আমাদের প্রাণে প্রাণে গ্রথিত।" পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক কঠোর অনুশাসনের বিধি শ্রবণ করিলে, এখনকার শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই শিহরিয়া উঠিবেন। তাঁহাদের প্রথম অনুশাসন,—

"সুখার্থী চেৎ ত্যজেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী
চেৎ ত্যজেৎ সুখম্।"

যদি বিষয়সুখ চাও, তবে বিদ্যার আশা ত্যাগ কর, যদি বিদ্যা চাও, তবে সুখের আশা ত্যাগ কর। কেননা,—

"যথা খাত্বা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥"

—যেমন খনিত্র দ্বারা অতিকষ্টে ভূতল খনন করিতে করিতে, তবে তন্মধ্যে বারিলাভ হয়, তেমনি শুশ্রূষাদি কঠোর সাধনা দ্বারা শিষ্য গুরু হইতে বিদ্যালাভ করে। সামগ্রস্যভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের এবং সংযমশীলতার অভাবই এক্ষণকার ছাত্রগণের দৈহিক ও মানসিক অকালপক্কতা ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয়তার সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে ব্রহ্মচর্য্য মানবের শাশ্বত, কল্যাণময় ধর্ম্মজীবনের একমাত্র সোপান, তৎপক্ষে গুরু ও শিষ্য উভয়েরি কিরূপ কঠোরতা স্বীকার্য্য, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী মনুবচনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনু বলিতেছেন;—মানবের সকল কার্য্যই

সঙ্কল্পমূলক। মনই সঙ্কল্পের উৎপত্তিস্থান। এজন্য সর্ব্বাগ্রে মনের সংযম চাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ বাক্ এই দশটি বহিরিন্দ্রিয় মনেরই অধীন, মনই ঐ গুলির প্রবর্ত্তক। অতএব মনকে জয় করিলেই আর সকলকে জয় করা হয় ;—

"যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।"

এই ইন্দ্রিয়গ্রামের যদি একটিও ইন্দ্রিয় বিচলিত (বিষয়প্রবণ) হয়, তবে, ঘটে একটী ছিদ্র থাকিলে ঘটের সমস্ত জল যেমন সেই ছিদ্রপথ দিয়া নিঃসৃত হয়, তেমনি তাহার সমস্ত প্রজ্ঞা অর্থাৎ ধীশুণ, অলক্ষ্যভাবে স্খলিত হয় (১)। সদাই সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্কল্পের পরিপোষণ ও সমঞ্জস ভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, দূষিত-প্রবৃত্তি নিবারণের উপায়। সেকালে ছাত্রগণের আধুনিক ব্যায়াম-প্রণালী ছিল না। কিন্তু গুরুকুলে বাসকালে তাহাদের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী দ্বারাই তাহারা ব্যায়ামের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিত। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (২) উঠিয়াই অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতে হইত। অনন্তর অরুণোদয়ে বেদগান করিতে করিতে নির্ম্মল স্রোতস্বতী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক, সন্ধ্যা-বন্দনা-জপ-হোমাদি যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইত। দূর হইতে ফল-জল-পুষ্প-কাষ্ঠ-নীবারাদি দৈনিক সমস্ত আহার্য্য শিষ্যগণকে আহরণ করিতে হইত। প্রত্যহ অবশ্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের (৩)

(১) "ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥"
(মনু, ২য় অধ্যায়, ৯৯ শ্লোক।)

(২) 'ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত'—রাত্রির শেষার্দ্ধপ্রহর, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধপ্রহরের অন্তর্গত দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রথমটী ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—নিশাশেষে, প্রায় ৪॥ টার সময়।

(৩) 'পঞ্চযজ্ঞ'—গৃহস্থমাত্রকেই প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞ অর্থাৎ পাঁচটী অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রত পালন করিতে হয়, নাহলে পিশাচমধ্যে গণ্য হইতে হয়। দেবলোকের, ঋষিলোকের, পিতৃলোকের, অতিথির ও লোকহিতৈষী, উপজীব্য সাধুগণের নিকট গৃহস্থমাত্রেই ঋণী। সুপবিত্র ও সুবিনীত কর্ম্ম দ্বারা এই পাঁচটী ঋণ যথাক্রমে পরিশোধ করিলেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা হয় ;—

"ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাং চ তথৈব চ।
পিতৄনামথ বিপ্রাণামতিথীনাং চ পঞ্চমম্।
পর্য্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুবিনীতেন কর্ম্মণা।
এবং গৃহস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ধর্ম্মান্ন হীয়তে ॥"
(মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব।)

দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকাদির যথাবিধি তর্পণ করিয়া, গৃহস্থ তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিবে,—

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্ ॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ং চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু।"

—পিতৃগণ আমাদের নিকট সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন। দাতৃগণের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হউক। আমাদের পবিত্র জ্ঞান ও সেই জ্ঞানে প্রদীপ্ত বংশপরম্পরা পরিবর্দ্ধিত হউক। ঈশ্বরের ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে যেন আমরা কদাচ বিচলিত না

সমস্ত আয়োজন প্রধানতঃ শিষ্যগণকেই করিতে হইত। দেহ, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য-শান্তির অপূর্ব্ব সহুপায়, এ সকল পবিত্র কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকায়, কাহারও কুচিন্তাদির আদৌ অবসরই থাকিত না। বিশেষতঃ সে সকল স্থানে কুপ্রসঙ্গের নাম-গন্ধও থাকা অসম্ভব। ব্রহ্মচারীর পক্ষে যাহা যাহা বিষবৎ পরিহার্য্য, মন্বাদি শাস্ত্র-কর্ত্তারা তাহার বিস্তীর্ণ তালিকা দিয়াছেন (১)। সে সকল তালিকা হইতে কোনটী উদ্ধৃত করিব? সকলগুলিই অমৃততুল্য উপাদেয়। প্রবন্ধের অতিবিস্তৃতিভয়ে কয়েকটীর উল্লেখমাত্র করিতেছি;—(১) সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্য এবং উত্তেজক ভক্ষ্যমাত্রই; (২) বিলাসিতাসূচক গন্ধানুলেপন ও বেশ ভূষা প্রভৃতি; (৩) প্রাণি-হিংসা; (৪) দ্যূতক্রীড়া; (৫) কাম-ক্রোধাদি; (৬) নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি; (৭) উচ্চহাস্য; (৮) বাক্‌কলহ, (৯) মিথ্যা-ভাষণ; (১০) সানুরাগ পরস্ত্রীদর্শন; (১১) কায়মনোবাক্যে পরাপকার; (১২) ছল-কপটতা প্রভৃতি; (১৩) গুরুজনের সমক্ষে উচ্চ আসনাদিগ্রহণ; (১৪) অশিষ্টতার বা অসভ্যতার সূচক কোনও প্রকার হাব-ভাব, এ সকল এককালে বর্জ্জনীয়। বল-বীর্য্যের ক্ষয়কর কার্য্যমাত্রই ব্রহ্মচর্য্যের সাংঘাতিক অনিষ্টকর, এজন্য প্রত্যেক ছাত্রকে একাকী সংযতভাবে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিতে হইবে।

"একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"
(মনু, ২ অধ্যায়)

ছাত্র—সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবে, বলক্ষয় কদাচ করিবে না। যে স্বেচ্ছায় বলক্ষয় করে, সে নিজ পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতকে বিনষ্ট করে। এজন্য শিষ্যকে কুচিন্তা বা কুসঙ্গের ছায়াও স্পর্শ করিতে নাই। যেমন আচার্য্যের প্রতি, তেমনি শ্রেয়স্কাম গুরুজনমাত্রেরি প্রতি অচলা ভক্তিই শিষ্যের আয়ু, আরোগ্য, বিদ্যা, যশ প্রভৃতি কল্যাণের নিদান। প্রাজ্ঞবর ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকার বলিতেন,—"গুরুভক্তি ও গুরু-জনবাধ্যতা, লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার একটী অমোঘ উপায়। পরীক্ষা দ্বারা এ তথ্য আমি জানিয়াছি।"

শিষ্যের শুধু স্মৃতিশক্তির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া, উপদিষ্ট বিষয়কে সে আত্মস্থ করিল কিনা, তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আচার্য্যের একান্ত কর্ত্তব্য।

"বহির্মুখাণি স্রোতাংসি কুর্য্যাদন্ত-
র্মুখাণি হি।
তদেব জ্ঞানং শিষ্যস্য শেষস্তু গ্রন্থবিস্তরঃ॥"

---

হই। যেন আমরা প্রত্যহ প্রচুর অন্ন-পান ও অতিথি লাভ করি। আমরা যেন অহরহঃ দীন-হীন-অনাথ-অন্ধ-আতুরগণের সেবা করিতে পারি। আমরা যেন কাহারও নিকট ভিক্ষা না করি। নিত্যই গৃহে অন্নের বৃদ্ধি হউক, এবং দাতারা চিরজীবী হউন। ইত্যাদি।

(১) মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮ &c. শ্লোক দেখ।

—আচার্য্য, শিষ্যের বহির্মুখ ইন্দ্রিয় স্রোতকে অন্তর্মুখ করিয়া দিবেন; এই অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায়। অধীত বিষয়ে যাহার অন্তর্দৃষ্টি না হয়, সে শিষ্য সহস্র গ্রন্থপাঠেও আত্মপ্রসাদ লাভ করে না, অধ্যয়নজনিত ফলভোগে সে বঞ্চিত হয়। তাহার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। (ক্রমশঃ।)

---

# পারস্য-কবি সেখসাদি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৫। একজন ফকির মরুভূমির প্রান্তভাগে নির্জ্জনে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট দিয়া একদিন এক রাজা গমন করিতেছিলেন। রাজাভোগ করিয়া যে সুখ না হয়, সন্তোষ থাকিলে সে সুখ হয়, সুতরাং ফকির রাজাকে দেখিয়াও দেখিলেন না ও তাঁহার কোনও সম্মান করিলেন না। ইহাতে রাজার অভিমান হইল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এই চীরধারী ফকিরগুলা বন্য পশুর মত—ইহারা একেবারে সৌষ্ঠব-শিষ্টাচার-বিহীন"। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী ফকিরের কাছে গিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার নিকট দিয়া রাজা গমন করিলেন, আপনি তাঁহাকে কোনও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই কেন?" ফকির বলিলেন, "রাজাকে বলিও,—যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোনও কাজকর্ম্মের প্রত্যাশা করে, সেই তাঁহার বন্দনা করিবে। আর যেন এই কথা নিশ্চয় তাহার মনে থাকে যে, ঈশ্বর রাজাকে প্রজা রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহাদের উপর আধিপত্য করিবার জন্য নহে। প্রজার হিতের জন্য রাজার সমৃদ্ধি, কিন্তু রাজা প্রজার রক্ষক ভিন্ন আর কিছুই নয়। যেমন, মেষপালক মেষ রক্ষা করিবে, মেষের উপর তাহার কোনও অধিকার নাই। অদ্য যাহাকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দেখিতে পাইবে, কল্য তাহাকে দারিদ্র্যে জরজরিত দেখিবে। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে আবার দেখিবে, সেই ঐশ্বর্য্যশালী মৃত্যুশয্যায় শায়িত—আর তাঁহার অভিমান ও গর্ব্ব নাই—কালের নিকট রাজাপ্রজার সম্বন্ধ নাই—ধূলায় দেহ পরিণত হইলে কে ধনী কে নির্ধন কেহ ঠিক করিতে পারে না।"

এই কথা শুনিয়া রাজার ফকিরের প্রতি বড় ভক্তি হইল। তিনি তাঁহার কাছে ফকিরকে কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ফকির বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে আর বিরক্ত না করেন।" রাজা বলিলেন,—"তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি উপদেশ দিন"। ফকির বলিলেন,—"সময় থাকিতে ধনৈশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার কর—কারণ, ধন বল, রাজ্য বল, চিরদিন এক হস্তে থাকে না"।

২৬। হারান উল রসিদের এক পুত্র এক-দিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"অমুক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র আমাকে আমার মাতার উদ্দেশে গালি দিয়াছে।" হারান মন্ত্রীদিগকে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল,—তাহার প্রাণদণ্ড করুন; কেহ বলিল,—তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলুন; আবার কেহ বলিল,—অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন। হারান বলিলেন,—"পুত্র! যদি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহা সর্ব্বোত্তম; যদি তোমার সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মাতাকে গালি দিতে পার, কিন্তু দেখিও প্রতিশোধের সীমার অতিক্রম না হয়, তাহা হইলে তোমার অনিষ্ট হইবে। মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করা বীরত্বের কাজ নয়। যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত হইয়া কথা কহিতে পারে, সেই বীর।"

এক ব্যক্তি নসিরবাণকে বলিল,—"আমি শুনিয়াছি, ভগবান্ কৃপা করিয়া পৃথিবী হইতে তোমার একজন শত্রুকে অপসারিত করিয়াছেন।" নসিরবাণ কহিলেন,—"সে ব্যক্তি কি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এ বিষয়ে তোমার কোনও সংবাদ আছে? সমকক্ষ লোকের মৃত্যুতে আনন্দিত হইবার কোনও কারণ নাই; আমারও জীবন ত চিরস্থায়ী নয়।"

২৭। আলেকজাণ্ডারকে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিয়া আপনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এত দেশ জয় করিয়াছেন? আপনার অগ্রে অনেক সম্রাট্—যাহারা সকলেই আপনার অপেক্ষা বয়সে বড় এবং অধিক ধনশালী ও বীর্য্যবান্ ছিলেন, তাঁহারা এত সহজে ত জয়লাভ করিতে পারেন নাই?" আলেকজাণ্ডার, বলিলেন,—"ঈশ্বরের প্রসাদে আমি যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তত্রত্য প্রজা-দিগকে আমি কখনও পীড়ন করি নাই, এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের রাজবংশের নাম লোপ করি নাই। যে ব্যক্তি পরাক্রমশালী পুরুষের অব-মাননা করে, তাহাকে কেহ উদারচেতা বলে না। রাজসিংহাসনই বল, আর রাজ্যই বল, প্রভুত্বই বল, আর পরাক্রমই বল —দিগ্বিজয়ই বল, আর জয়োল্লাসই বল, সকলই অসার, নিজের নাম চিরস্মরণীয় রাখিতে হইলে পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা করিতে নাই।"

২৮। এক যুবক তাহার পিতার সহিত মসজিদে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া-ছিল। সে সমস্ত রাত্রি আপনার ক্রোড়-দেশে কোরাণখানি খুলিয়া রাখিয়া জাগরিত ছিল; কিন্তু অন্যান্য লোক নিদ্রিত হইল। যুবক তাহার পিতাকে বলিল—"এই সকল লোকের মধ্যে কেহই মস্তকোত্তোলন করে নাই, প্রার্থনা করা ত দূরের কথা। ইহারা সকলে এত নিদ্রাভি-ভূত যে, দেখিলে বোধ হয় সকলেই মৃত।" ইহা শুনিয়া তাহার পিতা বলিলেন, এরূপ

লোকের নিন্দা না করিয়া তুমিও নিদ্রিত হইলে ভাল ছিল। স্বার্থপর লোক কেবল আপনাদের গুণ দেখে, দম্ভভরে অপরের গুণ দেখিতে পায় না। যদি ঈশ্বরের মত সে চক্ষুষ্মান্ হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সে নিজে কত নিকৃষ্ট তাহা দেখিতে পাইত।

২৯। একজন লোক স্বপ্নে দেখিল,—রাজা স্বর্গে ও সাধু নরকে গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—ইহার অর্থ কি? রাজার উন্নতি ও সাধুর অবনতি কেন হইল? আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহার বিপরীত হইবে। এমন সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইল,—রাজা সাধুদের ভাল বাসিতেন, সেই জন্য তাঁহার স্বর্গলাভ ও সাধু রাজসংস্রব রাখিতেন, সেই জন্য তাঁহার নিরয়বাস; কন্থা বা জপের ঝুলি কি করিবে? যাহাতে কুকর্ম্মে কলুষিত না হও, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর, ভেকধারণের প্রয়োজন কি? যদি কার্য্যে সাধু হও, তাহা হইলে মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিলেও ক্ষতি নাই।

৩০। এক ব্যক্তি কুচরিত্র ছিল। সে ঈশ্বরের কৃপায় সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমে সৎপথে আসিল। নিজের সমস্ত দুরভিসন্ধি সৎকার্য্যে পরিণত করিতে পারিল ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হইল। নিন্দুকেরা তথাপি বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তির পূর্ব্বস্বভাব এখনও আছে, ইহার সাধুতায় বিশ্বাস নাই।" এই সকল কথায় সে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"লোকের গ্লানি আমার আর সহ্য হয় না।" তাহার পিতা বলিল - "বৎস। খেদ করিও না, এ তোমার সৌভাগ্যের কথা! যাহারা তোমার নিন্দা করে, তাহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তুমি স্বয়ং সচ্চরিত্র হও, লোকের নিন্দাবাদে কি যায় আসে? তোমার চরিত্রে দোষ থাকিবে আর লোকে তোমাকে ভাল বলিবে, ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? দেখ লোকে আমাকে সাধু বলিয়া জানে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, আমি পাপের প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যাহা বলে, সেইরূপ হইলে আমি যথার্থই সাধু হইতাম। আমি আমার মনের ভাব প্রতিবাসীর নিকট গোপন করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমার অন্তরের সকল কথাই জানেন। আমার ও জনসাধারণের মধ্যে একটী রুদ্ধ দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া তাহারা আমার পাপের কথা জানিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামীর কি কিছু জানিতে বাকি থাকে? তিনি আমাতে যাহা প্রবহমান ও যাহা গুপ্ত, সকলি জানিতে পারেন।"

৩১। একজন ফকিরের সকল প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিতেন। তিনি একদা বাগদাদ নগরে আসিলে তদানীন্তন সুলতান তাঁহাকে তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে কোনও শুভ প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ফকির প্রার্থনা করিলেন,—"হে ঈশ্বর! তুমি এই ব্যক্তির জীবন লও"। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিরূপ প্রার্থনা?" ফকির বলিলেন,—"ইহা তোমার পক্ষে ও

সমস্ত মুসলমানদিগের পক্ষে হিতকর। তুমি যেরূপ অত্যাচারী—অসহায় প্রজারা আর কত দিন তোমার পীড়ন সহ্য করিবে? তোমার রাজত্বে প্রয়োজন কি? এরূপে প্রজা পীড়ন করা অপেক্ষা তোমার মৃত্যুই ভাল।"

৩২। এক অধর্ম্মী রাজা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রার্থনা অপেক্ষা ভাল কি?" সাধু বলিলেন,—"তোমার পক্ষে মধ্যাহ্নকালে নিদ্রা যাওয়াই ভাল; কারণ, এই সময়টুকুর জন্যও তুমি প্রজা পীড়ন করিবে না"। যে ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থা ভাল, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

৩৩। কোনও রাজা একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াতে সে বলিল,—"ক্রোধের বশীভূত হইয়া এ কার্য্য করিলে শেষে তোমারই অনিষ্ট হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ।" সে ব্যক্তি বলিল,—"এই দণ্ডের কষ্ট আমি এক মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিব, কিন্তু এই পাপের জন্য তোমাকে চিরকাল ভুগিতে হইবে। মানুষের জীবন তাপদগ্ধ মরু-স্থলের সু-শীতল সমীরণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ, সৌন্দর্য্য ও বিকলাঙ্গতা, সকলই সেইরূপ অস্থায়ী। তুমি বৃথা মনে করিতেছ যে, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া আমার অহিত করিলে, কিন্তু ফাঁসি আমার গলা হইতে শেষে তোমারই গলায় চিরদিন লাগিয়া থাকিবে।" এই কথায় রাজার চৈতন্য হইল এবং সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইতে বিরত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

৩৪। একদিন আমি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত নৌকারোহণে যাইতে-ছিলাম। আমাদের অগ্রে আর একখানি নৌকা যাইতেছিল। দৈবযোগে সেই নৌকা-খানি আবর্ত্তে পড়িয়া জলমগ্ন হইল। তাহাতে দুই ভ্রাতা ছিল। আমাদের একজন সঙ্গী সেই নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল,—"যদি তুমি এই দুইজনকে বাঁচাইতে পার, তোমাকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিব।" মাঝি একজনকে বাঁচাইল, আর একজন প্রাণ হারাইল। আমি বলিলাম, "ইহার নিয়তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই তুমি সত্বর হও নাই। ঐ ব্যক্তি মরিল—অপর ব্যক্তিকে তুমি কেমন তৎপর হইয়া বাঁচাইলে।" নাবিক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল--"আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য; সকলেই অদৃষ্টের বশীভূত। তথাপি আমি এই ব্যক্তিকে অন্তরের ইচ্ছার সহিত বাঁচাইয়াছি, কারণ, এ আমাকে এক সময়ে মরুভূমিতে পথশ্রান্ত দেখিয়া আমাকে উষ্ট্রে তুলিয়া লইয়াছিল ও অপর ব্যক্তি একদা আমাকে বিনা অপরাধে কষাঘাত করিয়াছিল। ঈশ্বরের যেমন দয়া, তেমনি সুবিচার। যে ব্যক্তি পরের মঙ্গল করে, শেষে তাহার মঙ্গল হয়, যে অনিষ্ট করে, তাহার অনিষ্টই হয়।"

৩৫। একদা কোন রাজার একজন মন্ত্রী এক সাধুর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিল—"দেখুন, দিবারাত্রি আমি

রাজসেবায় অতিবাহিত করি, কখনও কখনও তাঁহার অনুগ্রহের আশা হয়, আবার তাঁহার ক্রোধের ভয়ে মরি।" সাধু অশ্রু-মোচন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যেমন রাজাকে ভয় কর, আমি যদি জগদীশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিতাম, তাহা হইলে আমি এতদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতাম। রাজমন্ত্রিন্! তুমিও যদি রাজাকে যেরূপ ভয় কর, সেইরূপ ভয় ঈশ্বরকে কর, তাহা হইলে তুমিও স্বর্গের দেবতা হইবে।"

৩৬। একদা এক রাজা অর্ণবযানে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী দাসীপুত্র ছিল, সে কখন সমুদ্র দেখে নাই ও অর্ণব যানের কষ্টও কখনও অনুভব করে নাই। সমুদ্র দেখিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত ক্রন্দন করিতে লাগিল—কেহই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এই ঘটনায় রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারী বন্ধুদের আমোদ আহ্লাদের বিশেষ ব্যাঘাত হইল। জাহাজে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনি অনুমতি করিলে আমি এই বালককে চুপ করাইতে পারি।" রাজা বলিলেন, "যদি তাহা পারেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।" চিকিৎসক এই কথা শুনিয়া, সেই বালককে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। বালক উপর্য্যুপরি জলমগ্ন হইলে, তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া জাহাজের সন্নিকটে আনিলে সে দুই হস্তে হাল খানি জড়াইয়া ধরিয়া কোনও রকমে জাহাজের উপরে উঠিয়া এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মন্ত্রে ইহা সিদ্ধ হইল?" চিকিৎসক বলিলেন,—"মন্ত্র আর কিছুই নয়, এই বালক পূর্ব্বে কখনও জলমগ্ন হয় নাই, সুতরাং জলে পড়িলে কত বিপদ্ তাহা সে জানিত না, আবার জাহাজের উপর নিরাপদে থাকা কত বাঞ্ছনীয় তাহাও বুঝিতে পারিত না। লোকে যতদিন না রোগের হস্তে পড়ে, ততদিন স্বাস্থ্যের মূল্য কি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

---

# ধাত্রী পান্না।

সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় চির-মহিমাময়ী, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে চিরগৌরবান্বিতা ভারতভূমি চিরদিনই জগৎপূজ্যা। বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি এই ভারতের একটি গৌরবময় মহাতীর্থ। এই পুণ্যময় মহাতীর্থে কত মহাপুরুষ, কত দেবীস্বরূপিণী রমণীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের জলন্ত আত্মত্যাগ, অসাধারণ চরিত্রবল, অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগ, পবিত্র ধর্ম্মজীবন পরিদর্শনে মস্তক স্বতঃই সেই দেবদেবীগণের চরণতলে অবনত হইয়া থাকে। বীরবর সমরসিংহ, মহামানী ভীমসিংহ, সর্ব্বত্যাগী চণ্ড, কর্ত্তব্যপরায়ণ বাদল পুত্ত ও

জয়মল্ল, স্বদেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ, ঝালাপতি মান্না, মিবাররাজপুরোহিত, ও রমণীরত্ন পদ্মিনী মিবারভূমির গৌরব ও আদর্শ। এই দেবদেবীগণের জীবনচরিত অনুসন্ধান কর, স্বর্গীয় ভাবে ও অতীত গৌরবে তোমার হৃদয় পরিপূরিত হইবে। এই পুণ্যভূমির প্রত্যেক নদনদী, প্রত্যেক শৈল ও গুহা, প্রত্যেক কানন ও মরুভূমি, প্রত্যেক কীর্ত্তিস্তম্ভ ও হর্ম্ম্য এবং প্রত্যেক কুটীর ও জনপদকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা স্ব স্ব কাহিনী বিবৃত করিবে। দেখিবে, শিক্ষা করিবে যে, আমাদের মাতৃভূমির অন্ধকার দৈন্যের মধ্যেও কি মহান্ ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত আছে।

ধাত্রী পান্না এই মিবারের অন্যতম রমণীরত্ন। মহারাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর মিবাররাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটে। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা উদয়সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদয়সিংহের বয়ঃক্রম তখন ছয় বৎসর। তজ্জন্য সংগ্রামসিংহের দাসীপুত্র বনবীর রাজকার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু দুর্দ্দম রাজ্যলিপ্সা তাঁহার পাপপ্রাণে অবিরত জাগিতেছিল।* হায়! রাজ্যলিপ্সার কি মোহিনী শক্তি! ইহার বশে মানবহৃদয় কি শোচনীয় অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্নেহ, দয়া, কোমলতা প্রভৃতি সুকুমার প্রবৃত্তিনিচয় কি একবারে হৃদয় হইতে চিরতরে বিলীন হয়! স্নেহের আধার, দেবপ্রতিম শিশুসন্তানও কি রাজ্যলোলুপ পাশব হস্তে নিষ্কৃতি পায় না? স্বর্গ, মর্ত্ত্যের পবিত্র বন্ধন কি এতদূর শিথিল হইয়া যায়? ইহা কল্পনার অতীত। পাপমতি, নরপিশাচ বনবীর উদয়সিংহকে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কণ্টক বিবেচনায় তাহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল। সৌভাগ্যক্রমে উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না তাহা জানিতে পারে। মিবারভূমির সমূহ বিপদ ও শিশোদীয় বংশের ধ্বংস তাঁহার মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিন্তু এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত বনবীর, অন্য দিকে একটী অসহায়া রমণী। দুর্ব্বল রমণীহৃদয় কি বনবীরের পাপলিপ্সার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে? ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের করাল কবল হইতে শাবক উদ্ধার করা কি দুর্ব্বলা হরিণীর সাধ্য? পান্নার এরূপ চেষ্টা হয়ত বন্যাস্রোতে তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া যাইবে! কিন্তু রমণীহৃদয় আজ যে জ্বলন্ত আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হইল, এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। এই পতিহীনা রমণী তাহার একমাত্র হৃদয়ের ধন, জীবনসর্ব্বস্ব শিশুসন্তানটীকে বনবীরের পাপলিপ্সানলে আহুতি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজ কর্ত্তব্যের দ্বারে অপত্যস্নেহ উৎসর্গীকৃত হইল। পান্না উদয়সিংহের পরিবর্ত্তে আপনার স্নেহের পুত্তলীকে

তদীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া বধের সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নরপিশাচ বনবীর করাল-কৃপাণ-হস্তে আসিয়া পান্নাকে উদয়সিংহ কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। কি ঘোর পরীক্ষা! পান্না অবিচলিতচিত্তে আপনার নিদ্রিত শিশু পুত্রকে দেখাইয়া দিলেন এবং ক্রূর ঘাতকহস্তে হৃদয়সর্ব্বস্বের বধ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন। ধন্য দেবী পান্না! ধন্য রমণীহৃদয়! ধন্য তোমার অলন্ত আত্মত্যাগ!

"বিসর্জ্জিলে স্নেহ, মায়া কর্ত্তব্যের তরে,
পরহিতব্রতে আহা আত্মবিসর্জ্জন!
অপূর্ব্ব মহৎ শিক্ষা, অপূর্ব্ব সাধন,
দেখাইলে ভাল মতে অসার সংসারে।"

পাঠিকা, ঐ দেবীস্বরূপিণী পান্নার পার্শ্বে ঐ নরপিশাচ বনবীরের চিত্রের তুলনা কর। যেন অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী গম্ভীরমহত্ত্বব্যঞ্জক দেবীপ্রতিমার পার্শ্বে ঘৃণিত সয়তানের জঘন্য প্রতিকৃতি! একটী মানবচরিত্রের পূর্ণবিকাশ ও অপরটি মানবহৃদয়ের শোচনীয় অধোগতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেবী পান্না মিবারভূমে যে জলন্ত আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। এই আত্মত্যাগ মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া মিবাররাজকুলপুরোহিত একদিন নিজের হৃদয় দান করিয়া ভ্রাতৃহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ঝালা জনপদের সর্দ্দার মান্না নিজের জীবনদানে বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহামন্ত্রের উপাসক মহাবীর প্রতাপসিংহ প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে স্বদেশরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

---

# প্রতিশোধ।

(১)

রায়পুরের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার রায় শশাঙ্কশেখর বসু মহাশয়ের কাছারী বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে এক বর্ষীয়সী অবগুণ্ঠনবতী রমণী একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া, নেত্রজলে বক্ষ ভাসাইতেছিল। জমীদারের কর্ম্মচারিবৃন্দ যে যাহার নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত। রমণীর এতাদৃশ ক্রন্দন দর্শনে কৃতান্ত-সদৃশ প্রধান কর্ম্মচারী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক বলিল,—"তোমার কান্না এখন রাখিয়া দাও; তোমার কান্না দেখিবার জন্য কেহ এখানে ডাকে নাই, ওরূপ কান্না আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি। সাত মাসের খাজনা বাকি, একটী পয়সা এযাবৎ আদায় হয় নাই। আজ দিব, কাল দিব করিয়া সাত মাস লোকজনকে নাকালের একশেষ করিয়াছ। জমিদারের হুকুমে আজ

তোমাকে এখানে হাজির করা হইয়াছে। সাত মাহার খাজনা দিতে পার ভাল, না পার জমি হইতে উঠিয়া যাও।"

অবগুণ্ঠনবতী করুণস্বরে বলিল,—"বাবা! আমরা বড় গরীব; আমার স্বামী আজ এক বৎসর রোগশয্যায় শায়িত; তিনি—" বিকট গর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী বলিল,—"তোর স্বামী রোগ-শয্যায় শুয়ে ত জমিদারের কি? তুই নিজে উপার্জ্জন করিয়া দিতে পারিস না? তোর এখনো ত"—বালক আর সহ্য করিতে পারিল না; এতক্ষণ নীরব ছিল, উত্তেজিত হইয়া বলিল, তুমি ভদ্র মহিলার সহিত কি প্রকারে কথা কহিতে হয় জান না। আজ আমাদের অবস্থা মন্দ, তাই মা জমিদারের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত, নচেৎ আমার মার মুখ চন্দ্র সূর্য্যের অদর্শনীয় ছিল। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তুমি এমন করিয়া আজ আমার মার অপমান করিলে।"

সক্রোধ তীব্র দৃষ্টি দানে প্রধান কর্ম্মচারী উচ্চরবে বলিল, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ছোঁড়ার ত তা'র মুখ দেখিতেছি। আমি তোর মার অপমান করিয়াছি, আর জমিদার আসিয়া কি তোর মার পূজা করিবেন? দরিদ্রের আবার ভদ্রাভদ্র কি? তার আবার মান অপমান কি?" এই দুর্ব্বাক্য শুনিয়া, ক্রোধে বালকের গৌরমুখ আরক্ত হইল, সাহস সহকারে ঘৃণা-ব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "জমিদার আসুন, যাহা বলিতে হয় তিনি বলিবেন। শাস্তি দিতে হয়, তিনি দিবেন। তুমি সামান্য একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তুমি বলিবার কে? তোমার অধিকার কি?" "তবে রে পাজী ছোঁড়া, যত বড় মুখ তত বড় কথা! দেখি আজ তোকে কে রক্ষা করে।" বলিয়া লম্ফ দিয়া সেই নির্ম্মম কর্ম্মচারী, বালকের নবনীত সদৃশ কোমল অঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ঠিক এমন সময়ে দুই জন দ্বারবান্ উচ্চকণ্ঠে জমিদার মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিল। ত্রস্তে কর্ম্মচারিবৃন্দ, জমিদার মহাশয়কে অভিবাদন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। জমিদার মহাশয় একখানি বহুমূল্য আসন দখল করিবার পর কর্ম্মচারিবৃন্দ স্বীয় স্বীয় আসন গ্রহণ করিল। বালক যে গোমস্তার নিকট প্রহৃত হইয়াছিল সেই কর্ম্মচারী জমিদারের সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! বাঘনাপাড়ার হরিশ বাবু সাত মাস খাজনা দাখিল করে নাই, এজন্য তাহাকে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অসুখের জন্য হাজির না হওয়ায় তাহার স্ত্রীকে হাজির করিবার জন্য হুজুর আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে আজ হরিশের স্ত্রীকে দরবারে হাজির করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পুত্র ধর্ম্মাবতারের এই কাছারীবাড়ীতে বসিয়া আমাকে সেজন্য যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছে।"

এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "কে আছিস্

রে।” তৎক্ষণাৎ একজন পাইক সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে বলিল, “ধর্ম্মাবতার! আজ্ঞা করুন। আজ্ঞা হইল—“পঁচিশ বেত লাগাও।” হুকুম মাত্র বালকের মাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া বলিল, “বাবা! এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার করিবেন না, আগে আমার কথা শুনুন, তৎপরে যদি আমার পুত্র দণ্ডের উপযুক্ত হয়—” বাধাদানে জমিদার বলিলেন, “তফাৎ যাও তফাৎ যাও; কোন কথা শুনিব না। এত বড় স্পর্দ্ধা। আমারই কাছারীতে বসিয়া আমার লোকের অপমান। দরওয়ান! যাও, হুকুম মত কাজ কর।”

এই আজ্ঞা শ্রবণে মাতার নিকট হইতে পুত্রকে যখন দ্বারবান্ কাড়িয়া লইল তখন রমণী মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে বলিল, “হা ভগবান্! আমার অভাগা দরিদ্র সন্তানকে আজ রক্ষা করে এমন লোক কি কেহ নাই?” সেই করুণ স্বর উপস্থিত অনেকেরই হৃদয় আর্দ্র করিল, কিন্তু জমিদারের ভয়ে কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। বালক বলিল, “মা! কাঁদিও না, তাহলে আমার ধৈর্য্য থাকিবে না, তুমি বাড়ী যাও, আমি যাইতেছি।” কিন্তু রমণী এক পদও অগ্রসর হইল না; পাষাণে বুক বাঁধিয়া, পুত্রের বেত্রাঘাত দর্শন করিল। তারপর সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত পুত্রকে বক্ষে লইয়া বাটী আসিল।

অভাগিনী আসিয়া দেখিল বিপদের উপর বিপদ—মুমূর্ষু স্বামীর অন্তিম মুহূর্ত্ত উপস্থিত। রোগীর দেহে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত। রমণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মর্ম্মভেদী রোদনে বালকের হৃত চেতনা ফিরিয়া অ[illegible]। ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা! কি হইয়াছে?” “আর কি দেখ বাবা! আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে আর দেরী নাই।” মাতার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে জমিদারের দুই জন লাঠিয়াল আসিয়া বলিল, “জমিদারের হুকুম, তোমরা বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাও।” রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা! দেখিতেছ আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আর একটু অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর পাইকদ্বয় বলিল, “আমরা কি করিব? কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, জমিদারের হুকুম অগ্রাহ্য করে? তোমাদের এই দণ্ডেই উঠিতে হইবে।”

‘হা ভগবান্! তুমি কোথায়’ বলিয়া দুর্ভাগিনী কাঁদিতে লাগিল। বালক বলিল, “মা! কাঁদিয়া ফল কি? আইস বাবাকে ধরিয়া ঐ গাছতলায় লইয়া যাই।” তখন মাতা পুত্রে ধরাধরি করিয়া রুগ্নকে বৃক্ষতলে শয়ন করাইল। লাঠিয়ালদ্বয় গৃহরক্ষায় নিযুক্ত হইল। রুগ্নের শেষ সময় উপস্থিত। কষ্টে একবার চক্ষু মেলিয়া পত্নী ও পুত্রের প্রতি চাহিলেন, অমনি দরবিগলিত অশ্রুধারায় বদন ভাসিয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া হরিশ বসুর পার্থিব প্রাণ পঞ্চভূতে

গেল। মাতাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া বালক সুরেশ প্রতিবাসী রামলোচন বাবুকে নিজের বিপদবার্ত্তা জানাইল। তিনি বলিলেন, "আমাকে অগ্রে কেন খবর দাও নাই? গাছতলায় এমন করিয়া অনাথের মত না রাখিয়া, হরিশ দাদাকে আমার বাড়ী লইয়া গেলে না কেন?" সুরেশ মনে মনে ভাবিল, হায়! পৃথিবীর সবাই যদি রামলোচন কাকার মত হইত। তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল, "কাকা মশায়! যা অদৃষ্টে ছিল হইয়াছে, এখন যা'তে বাবার সদ্গতি হয়, তাহার উপায় করুন।" রামলোচন বাবুর চেষ্টায় সৎকার্য্যের কোনও ত্রুটি হইল না। গগন-ভেদী হরিবোলের সহিত শব লইয়া যখন সকলে শ্মশানে যাত্রা করিল, তখন সুরেশ একবার উদাস নয়নে চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া বলিল, "আজ আমি পিতৃহীন—গৃহহীন—জানি না আমার স্থান কোথায়!"

এই আখ্যায়িকার পর পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। সেই সদ্য পতিহীনা ও তাহার বালক পুত্র সুরেশ কালের আবর্ত্তনে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে কে জানে? কিন্তু সেই পিশাচসদৃশ জমিদার রায় শশাঙ্কশেখরকে পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে।

প্রসিদ্ধ মুঙ্গের সহরে একটী শ্বেতধবল অট্টালিকার পাদমূল ধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী সাগর উদ্দেশে প্রবাহিতা। সেই অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে রুগ্নশয্যায় একজন যুবক শায়িত, পার্শ্বে বিবন্ন বদনে আমাদের পূর্ব্বোক্ত জমিদার মহাশয় রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এই যুবক ললিতমোহন, জমিদার মহাশয়ের একমাত্র বংশধর। আজ এক বৎসর ললিত কঠিন জ্বরে আক্রান্ত, ডাক্তারের পরামর্শে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য শশাঙ্ক বাবু আজ ছয় মাস মুঙ্গের বাস করিতেছেন। সহরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তার দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনই সুফল এপর্য্যন্ত দর্শায় নাই। সম্প্রতি একজন যুবক বাঙ্গালী ডাক্তার ললিতকে দেখিতেছেন। অদ্য তাঁহার আসিবার কথা, শশাঙ্ক বাবু উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভৃত্য সংবাদ দিল, ডাক্তার আসিয়াছেন। যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া শশাঙ্ক বাবুকে অভিবাদন পূর্ব্বক রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে রোগীকে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিলেন। ডাক্তারের মুখ অপ্রসন্ন দেখিয়া শশাঙ্ক বাবু কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, —"ডাক্তার বাবু! আমাকে আর সংশয়ে রাখিবেন না, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে আমি অনুমানে তাহা বুঝিয়াছি, অতএব স্পষ্ট ভাবে আপনার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করুন, কোনও বিষয় গোপন করিবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন সত্যই তাহাই। রোগীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা, কিন্তু নিরাশ হইবার আবশ্যক নাই।" "বলেন কি ডাক্তার বাবু? আমার আর কোনও আশা আছে? আপনি কোন্ আশায় আমায় প্রবোধ দিতেছেন?

বলুন, বলুন, আপনি কি আশার কোনও আশ্বাস পাইয়াছেন? সত্য কি অভাগার সন্তান বাঁচিবে?" বৃদ্ধ, ডাক্তারের দুটী হস্ত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অশ্রুমোচন করিয়া পরদুঃখকাতর ডাক্তার বলিলেন, "মহাশয়! অত উতলা হইবেন না। যাহা বলি, স্থির হইয়া শুনুন। আপনার পুত্রের জ্বরের জন্য আমি ভয় করি না, কিন্তু উহার শরীরে রক্তের সম্পর্ক নাই, উহাই হইতেছে বেশী ভয় ও আশঙ্কার কথা। কিন্তু কোনও উপায়ে যদি রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা যায় অর্থাৎ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এযাত্রা নিশ্চয় রক্ষা পাইবে।" বৃদ্ধ বলিলেন, "রক্ত—রক্ত—কি প্রকারে দেওয়া যাইবে ডাক্তার বাবু! এ যে অসম্ভব কথা।" ডাক্তার বলিলেন, "অসম্ভব কিছুই নাই। আমি ডাক্তারী শিক্ষার ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে একের শোণিত অপর দেহে যন্ত্রের সাহায্যে দিতে পারি, কিন্তু যে দিবে তাহার জীবন সংশয়। বৃদ্ধ বলিলেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি, আমিই দিব। ডাক্তার বলিলেন, —"না, বৃদ্ধ ব্যক্তির রক্তে বেশী সুফলের আশা করা যায় না। নীরোগ, বলিষ্ঠ যুবকের শোণিতে উপকারের সম্ভাবনা।" এই কথা শুনিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সবিষাদে শশাঙ্ক বাবু বলিলেন, "তা হলে ডাক্তার বাবু রক্ষার আর কোনও উপায় নাই।" ডাক্তার বলিলেন, "কেন নাই? আমি আমার রক্ত ললিতকে প্রদান করিব।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিলেন, —"সেকি কথা? আমি এমন অধর্ম্ম করিব না, ইহাতে আমার ললিত না বাঁচে, উপায় নাই।" একটু মৃদু হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমি স্বেচ্ছায় দিতেছি। তাহাতে আপনার আপত্তি কেন?" বৃদ্ধ বলিলেন, —"আপনি যদি কোনও প্রকার অর্থের আকাঙ্ক্ষা করেন তা হলে—"

বাধাদানে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, না, শশাঙ্ক বাবু! তাহা ভাবিবেন না। আমি অর্থের প্রলোভনে আসি নাই। আমি অর্থের আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমার জীবন বড় দুঃখময়, এ জগতে আমার বলিতে আমার কেহ নাই। আমার এ জীবনের কোনও মূল্য নাই। এ প্রাণ গেলে কিম্বা থাকিলে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু আপনার বংশধর যদি এই হতভাগা দ্বারা রক্ষা পায়, তাহা হইলে জগতের অনেক উপকার হইবে, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা সহস্র সহস্র অনাথ দরিদ্র প্রতিপালিত হইবে, অতএব অকালে এ স্বর্গীয় সুরভি কুসুমটী শুষ্ক হইতে দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নয়; এই জন্য আমার এত আগ্রহ।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ডাক্তার বাবু! আপনার এ মহাপ্রাণতার জন্য—আপনার এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না।" ডাক্তার বলিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার জীবনে কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই,

তদ্বিষয় রক্ত প্রদানে যে সত্য সত্য আশঙ্কা আছে, এমন কোনও কথা নাই।" "আপনার জীবন এত কি দুঃখময় যে প্রাণে এত বিতৃষ্ণা? ডাক্তার বাবু সবিনয়ে বলিলেন,—সে কথা অন্য এক দিন বলিব, কিন্তু আমি যে প্রস্তাব করিলাম, আপনি স্বীকৃত না হইলে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইব।"

তৎপরে অনেক বাদানুবাদের পর ডাক্তার বাবুর জয় হইল। শশাঙ্ক বাবু স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে স্বীয় শোণিত ললিতকে প্রদান পূর্ব্বক ডাক্তার স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

( ক্রমশঃ )

---

# প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুরমণী।

অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে, আকুল প্রাণে, বিহ্বল-হৃদয়ে একটী প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর কথা লিখিতেছি। ইনি কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, বেনিয়াটোলা-নিবাসী স্বনামধন্য শ্রীমান্ ডাক্তার হরিধন দত্তের জননী। ইনি ২০এ অগ্রহায়ণ, সোমবার, রজনীতে, প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে, সজ্ঞানে, পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-পুত্রবধূ-কন্যা-জামাতা-দৌহিত্রাদি ও তাহাদের সন্তানসন্ততি এবং আত্মীয়-জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য প্রাণারাম পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিতা হইয়া, পুলকিতহৃদয়ে প্রোৎফুল্লবদনে, সেই পতিতপাবন মঙ্গলময়কে ডাকিতে ডাকিতে অনন্ত শান্তি-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। অন্তিমকালে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব শান্তিময়, আশ্চর্য্য-দৃঢ়তাপূর্ণ, দিব্যপ্রসাদমধুর, নির্ব্বিকার ভাবটুকু লক্ষ্য করিলে, জ্ঞান হয়, যেন, তাঁহার জীববিহঙ্গ ভৌতিক দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া, সংসারের অচ্ছেদ্য মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, চিরপরিচিত, চিরশান্তিময় স্থানে চলিয়াছে। আর কার সাধ্য, সে আত্মারাম, আনন্দধামের পথিক বিহঙ্গকে রোধ করিতে পারে।

এই ধর্ম্মপ্রাণা, মহাপ্রভাবা, দয়াময়ী দেবীকে দেখিলেই মনে হইত, যেন ঈশ্বরের বিশ্বপালনী সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাপিত হৃদয়ের সর্ব্বসন্তাপ দূরে যাইত, হৃদয় ভক্তিরসে ও আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইত। এমন উদারহৃদয়া, এমন মুক্তহস্তা, এমন ত্যাগশীলা, এমন স্নেহময়ী, ধর্ম্মপ্রাণা দেবী নরলোকে দুর্লভ। স্বর্গা-রোহণের পূর্ব্বদিনে সমস্ত পরিবারকে নিকটে ডাকিয়া, যাহার যাহা কর্ত্তব্য, যাহার যাহা হিতকর, তাহা ধীরে ধীরে উপদেশ ও আদেশ করিয়া এবং প্রত্যেকের মস্তকে হস্ত দিয়া প্রেমগদগদবাক্যে বারবার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম উপদেশের সারমর্ম্ম,—অটল ধৈর্য্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সহকারে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন। গঙ্গাযাত্রাকালে তাঁহার কি সাধ আছে, জিজ্ঞাসা করায়, কহিলেন,—

আমাকে তীরস্থ করিবার সময় কাঙ্গাল-গরিবদিগকে কিছু কিছু দান করা। পুত্র-রত্ন হরিধন সে সময় পথের দুইধারে দীন-দুঃখী সকলকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

তিনি বড় ভাগ্যবতী। তাঁহার কোনও সাধ অপূর্ণ ছিল না। বর্ষে বর্ষে দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, শ্যামাপূজা, প্রভৃতি উৎসবে ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে অন্ন, জল, বস্ত্রাদি প্রাণ ভরিয়া বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যিনি যাইতেন, তাঁহাকে শুষ্ক মুখে ফিরিতে হইত না। মিষ্টান্নে ও মিষ্টবচনে তাঁহার দেহ, মন, পূর্ণ হইত। তাঁহাকে কাছে বসাইয়া, সকল সংবাদ লইতেন। সে যে কি প্রাণভরা মমতা! তাহা ব্যক্ত করা যায় না। রোগশয্যায় তাঁহার নিকট উপাদেয় মিষ্টান্ন ও দুর্লভ নানা ফল মূল আনীত হইত; তিনি অবশ-শিথিল হস্তেও সেই ভক্ষ্য লইয়া, সকলকে খাওয়াইতেন। পরদুঃখে এমন প্রাণগলা নারী নরলোকে দুর্লভ। পরার্থেই তাঁহার স্বার্থ, পরতৃপ্তিতেই তাঁহার তৃপ্তি। তিনি বলিতেন, —অপরকে খাওয়াইয়া পরাইয়া আমি যে তৃপ্তি লাভ করি, নিজে খাইয়া পরিয়া সে তৃপ্তি পাই না। তাই আমি পরকে অন্ন-বস্ত্র দিতে ভাল বাসি।

"তাং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।"

তাঁহারি প্রভাবে ও পুণ্যে পটলডাঙ্গার এই দত্তপরিবার সর্ব্বলোকপ্রিয়। এ পরিবারের কোনও উৎসবে বা ব্যসনে কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয় না। সকলেই অনাহূত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, 'অহম্পূর্ব্বমহম্পূর্ব্বম্'—আমি আগে—আমি আগে, এই ভাবে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বুক দিয়া ইহাঁদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সুশীল হরিধন বিদ্যা, বিনয় ও সৌজন্যের আধার। পিতা-মাতার পুণ্যেই আজি হরিধন বিশ্বপ্রিয় ও বিশ্ববন্ধু। হরিধন প্রেসিডেন্সি কলেজে B. A. অধ্যয়ন করিয়া, মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত। হরিধন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির গণ্য মান্য কমিসনার এবং দায়িত্বপূর্ণ, লোকহিতকর, প্রধান প্রধান, বহুতর অনুষ্ঠানসমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ। মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার মঙ্গলচেষ্টা হরিধন কায়মনোবাক্যে করিয়া থাকে। হরিধনের মাতৃভাষায় লিখিত "নারীজীবন" গ্রন্থ যথার্থই নারীজীবন। ইহা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিত্যপাঠ্য ও ইহার অমৃতময় উপদেশগুলি গৃহিমাত্রেরি উপজীব্য। এত অল্প বয়সে প্রগাঢ়-প্রবীণ-দুর্লভ এরূপ বিচারশক্তি, প্রজ্ঞা, ধীরতা ও ভূয়োদর্শন কেবল মাতৃপুণ্যেই সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই মহাপ্রাণা মাতৃদেবীর পতিপুত্রহীনা চতুর্থকন্যার মাতৃভক্তি যাহা দেখিলাম, তাহাই এ জগতে মাতৃভক্তির চরম সীমা। একমাত্র জীবন-সর্ব্বস্ব শিশুসন্তানের সঙ্কটপীড়ায় তাহার গর্ভধারিণী যাহা করিতে পারে, এ মাতৃ-

ভক্তার মাতৃসেবার নিকট তাহাও নগণ্য। এ কন্যা সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ছায়ার ন্যায় মাতৃদেবীর অনুবর্ত্তিনী। ইনি সুদীর্ঘকাল অহোরাত্র আহার-নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক অশ্রান্তভাবে মাতৃসেবা করিয়া, নিজ জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়াছেন। ধ্রুব-প্রহ্লাদের যেমন হরি, এ নারীর তেমনি মাতৃদেবীই অদ্বৈত সাধনা। ঈশ্বরারাধনায়, নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মে, রোগীর শুশ্রূষায় ও মাতৃসেবায় এই নারীর তুলনা মিলে না। দীনবন্ধো! জগদীশ! তুমি এ শোকমূর্চ্ছিতা মাতৃপ্রাণা অবলার মাতৃ-শোকানলে শান্তিধারা বর্ষণ কর!

হে দয়ানিধে! মঙ্গলময়! জগদীশ! তুমি এ ধার্ম্মিক পরিবারে অনুক্ষণ তোমার অজস্র করুণা বর্ষণ কর! ভাই হরিধন! আজি তোমার সঙ্গে আমরা অনেকেই মাতৃহীন হইলাম! তোমার এ হতভাগ্য দাদা তোমাদিগকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে? আমি তোমাদের মুখ দেখিয়া এ শোক ভুলিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু পারিব কি? ভাই! আমার এ বয়সে ও এ ভগ্নদশায় এ আঘাত বড় সাংঘাতিক লাগিয়াছে। ভাই! তুমি সে দেবদুর্লভ মাতৃহৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া আমাদের সকলের প্রাণে সান্ত্বনা দান কর! তাহাতেই আমরা কথঞ্চিৎ এ শোক সংবরণ করিব।

মা গো! তুমি স্নেহ-সুধার খনি, দয়া-দাক্ষিণ্যের কল্পলতা, সতীত্ব ও পবিত্রতার প্রদীপ্ত মূর্ত্তি! মা! তোমার বিশ্বপ্রেমের আলেখ্যস্বরূপ—সে স্নেহার্দ্র বদনমণ্ডল,—সে অমৃতবর্ষী কুশলসম্ভাষণ,—সে বুকভরা আশীর্ব্বাদ,—আমাদের শুভসংবাদে তোমার সে আনন্দোচ্ছ্বাস, আমাদের অসুখের সংবাদে তোমার সে হৃদয়ব্যথা, সহানুভূতি ও শুভাশীষ, সকল কথাই আজি একে একে মনে উদিত হইতেছে এবং এই কৃতঘ্ন পাষাণ-চিত্তকেও তুষাগ্নিসম দগ্ধ করিতেছে! মা! কি স্বগৃহের কি আত্মীয়-গৃহের সকলের কুশলসংবাদ না লইয়া তুমি জলগ্রহণ কর নাই। আজি আমাদের সংবাদ কে লইবে? 'মাগো! মা—মা' বলিয়া স্ফীত-বক্ষে ডাকিতে ডাকিতে আর কাহার কাছে ছুটিয়া যাইব?

মা গো! অন্তিমে তোমার সে "তারা-তারা-ব্রহ্মময়ী"—নামের ধ্বনি সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইতেছে, সে অক্ষয় ও অবিকারী নামব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে স্তরে মিশিয়াছে, উহা অব্যক্তভাবে কোটি কোটি জীবকে ধৃতপাপ করিবে। যাও মা! আনন্দধামে আনন্দময়ের অনন্ত শান্তি-ছায়ায় চিরনির্ব্বাণ লাভ কর! আমরা কুসন্তান, মা থাকিতে মার মর্য্যাদা বুঝি নাই! এ মর্ম্মবেদনা এ অনুতাপাশ্রু কোথা গিয়া জুড়াব মা!—

তোমার
অভাগা সন্তান।

# দিদিমার রূপকথা। *

নীলকমল।

এক যে রাজা, তাঁর ছিল দুই রাণী। বড় রাণীর সন্তান না হওয়াতে রাজা ছোটরাণীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু বড় রাণীই রাজার রাজ্যের, রাজসংসারে সর্ব্বময়ী গৃহিণী। ছোট রাণী দাসীর মত বড় রাণীর আজ্ঞা মানিয়া চলেন। বড়রাণীই ছোটরাণীকে খাইতে দেন, পরিতে দেন, কাজকর্ম্ম করিতে দেন, কিন্তু তবু সতীনের উপর হিংসাটুকু ছাড়িতে পারেন না। ছোট রাণী অতশত কিছুই বোঝেন না, দিদি যখন যাহা বলেন, তাহাই করেন।

ছোট রাণীর সন্তানের লক্ষণ হইল, রাজা খুব ঘটা করিয়া পঞ্চামৃত সাধ দিলেন। শেষে দশমাস দশদিনে ছোট রাণীর প্রসব-বেদনা হইয়া সোণার চাঁদের মত একটী ছেলে হইল। রাজপুরীতে ঢাক, ঢোল বাজিয়া উঠিল। রাজা আহ্লাদে গরীব, দুঃখীকে কত দান-ধ্যান করিতে লাগিলেন। হিংসুকে বড় রাণী মনে মনে জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কোনও কথা বলিলেন না।

ছয় দিনে ছেলের ষেটেরা হইল, ছেলের-রূপে আঁতুড় ঘর আলো; দাইমা সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া দরজা আগলিয়া বসিয়া রহিল, বিধাতাপুরুষ ছেলের কপালে লিখিতে আসিবেন।

রাত্রি অনেক হইল, লোকজন সব নিষুতি হইল, পৃথিবী নিঝুম হইল; দাই-মার তন্দ্রা আসিল, তখন সোণার দোয়াত কলম হাতে করিয়া বিধাতাপুরুষ ঘরে আসিলেন।

যে পথে ঘরে ঢুকিবেন, সেই পথ বন্ধ, ছেলের দাইমা শুইয়া আছে; সুতরাং বিধাতাপুরুষ বলিলেন,—"পথ ছাড়, ঘরে যাইব।"

চমকিয়া দাইমা বলিল,—"তুমি কে?"

উত্তর হইল,—আমি বিধাতাপুরুষ; ছয় রাত্রিতে কপালে লিখিতে হয়; রাজার ছেলের কপালে লিখিতে আসিয়াছি, পথ ছাড়।

দাইমা বলিল, রাজার ছেলের কপালে কি লিখিবেন, তাহা না বলিলে আমি দরজা ছাড়িব না।

* শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুরমার" এবং "ঠাকুর দাদার ঝুলি" পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সোণার শৈশবের সুখময়ী স্মৃতি আবার আমাদের মানস-চক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেক স্বদেশী জিনিষের সহিত সে কালের "রূপকথা" আমরা হারাইতে ছিলাম। এখন পুরুষেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের গৌরবের কথা হইলেও আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা বটে। সেই লজ্জা ঘুচাইতে আজি বামাবোধিনীতে এই "দিদিমার রূপকথা"র অবতারণা। স্নেহময়ী মাতৃগণ এই পুরাতন জিনিষ গ্রহণ করিবেন কি? লেখিকা—

বিধাতাপুরুষ বলিলেন, "আমি তাহা বলিতে পারিব না, কেননা আমার এই কলমে যে সব আখর উঠে, তাহাই অদৃষ্টের লিখন হইয়া থাকে, আমি ইচ্ছা করিয়া কিছুই লিখি না।"

তখন দাইমা বলিল, "তবে যাইবার সময়ে আপনি যাহা লেখেন, তাহা আমাকে বলিয়া যাইবেন।" বিধাতাপুরুষ সম্মত হইলে, দাইমা পথ ছাড়িয়া দিল।

অদৃষ্টের লিপি লেখা হইয়া গেলে বিধাতাপুরুষ চলিয়া যাইবার সময়ে দাই আবার তাঁহার পথ বন্ধ করিল, আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখিলেন, বলিয়া যান।"

বিধাতাপুরুষ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন,—"আর সব ভাল, কেবল একটু খানি খারাপ হইয়াছে।"

ছেলের দাইমা বড় জেদ করিয়া তাহা শুনিতে চাহিল। তখন বিধাতাপুরুষ বলিলেন,—"যখন ছেলের বিবাহ হইবে, তখন মরা বর আর বিধবা কন্যা হইবে।"

দাই শিহরিয়া উঠিল। শেষে ছেলের পরমায়ু কিসের মধ্যে, সেই কথা বিধাতার নিকট হইতে জানিয়া তাঁহাকে দুয়ার ছাড়িয়া দিল।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মতন রাজার ছেলে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। ছয়মাসে ছেলের অন্নপ্রাশনের সময়ে রাজা নাম রাখিলেন "নীলকমল"।

ছেলে এক বৎসরের না হইতেই বড় রাণী তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গেলেন। ছোট রাণী কত কান্নাকাটি করিলেন, বড় রাণী তাহাতে কাণ দিলেন না, রাজাও বড় রাণীর ভয়ে ছোট রাণীকে কিছুই বলিলেন না। নীলকমলের যখন জ্ঞান, বুদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সে বড় রাণীকে নিজের মা এবং ছোট রাণীকে ছোট মা বলিয়া বুঝিল। বড় রাণী নীলকমলকে তাহার ছোট মার ত্রিসীমায় যাইতে দিতেন না।

এমন সময়ে নীলকমলের দাইমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সে বুড়ী ছোট রাণীকে ডাকিয়া নীলকমলের পরমায়ুর কথা তাঁহাকে গোপনে বলিল, তার পর সে মরিয়া গেল।

কত বৎসর যায়, মনের দুঃখে ছোট রাণীর দিন কাটে। ছোট রাণী পায়ে আল্‌তা পরে না, গায়ে গহনা দেয় না, ভাল কাপড় পরে না। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে দিনরাত কাটায়। এমন সময়ে এক দিন তাহার ঘরের দুয়ারে গিয়া নীলকমল ডাকিল,—"ছোট মা।"

ছোট রাণী ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে কোলে করিলেন। মাথায় চুমু খাইয়া বলিলেন, "বাবা আমার, যাদু আমার। তুই আমার পেটে জন্মিয়া ছিলি; বড় রাণী তোর সৎমা, আমার কোল হইতে তোকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

ছেলে মাথা হেঁট করিয়া, খানিক পরে বলিল,—"ছোট মা! আমার পরমায়ু কিসের মধ্যে, সেই কথা তুমি জান, আজি আমাকে তাহা বলিয়া দাও।"

ছোট রাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি সর্ব্বনাশী আমার সর্ব্বনাশ করিবে, আমি কিছুতেই বলিব না।"

নীলকমলও ছাড়ে না, শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া খানিকক্ষণ পরে ছোট রাণী বলিলেন,—"তোমার পরমায়ু ঘৃতের মধ্যে, বড় রাণীকে বলিও তোমাকে যেন ঘৃত খাইতে না দেন।"

নীলকমল গিয়া বড় রাণীকে সব কথা বলিল। বড় রাণী কলসী কলসী ঘৃত আনাইয়া নীলকমল টের না পায় এমন করিয়া তাহাকে ঘৃত খাওয়াইতে লাগিলেন। নীলকমল ঘৃত খাইয়া খুব মোটা সোটা, বলিষ্ঠ ও সুস্থ হইতে লাগিল।

এক বছরের পরে আবার এক দিন নীলকমল ছোট রাণীর ঘরে গেল। আবার ছোট রাণী ছেলের কপালে চুমু খাইয়া কোলে করিয়া, ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন নীলকমল বলিল,—"ছোট মা! তুমি আরবারে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে। এবারে সত্য করিয়া বল, আমার পরমায়ু কিসের মধ্যে," ছোট রাণী জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"তোমার পরমায়ু ডালিমের মধ্যে, তুমি ডালিম খাইও না।"

নীলকমল বড় রাণীকে সব কথা জানাইল। বড় রাণী দেশ, বিদেশ হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি ডালিম আনিয়া তাহার রস নীলকমলকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

ডালিমের রস খাইতে খাইতে নীলকমল সুন্দর ও সবল হইতে লাগিল।

এক বৎসর পরে আবার নীলকমল ছোট রাণীর ঘরে গেল। ছোট রাণী ছেলেকে আদর করিয়া কোলে টানিতেই ছেলে বলিল,—ছোট মা! তুমি আমার সাথে বারে বারে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, এবারে যদি তুমি ঠিক করিয়া আমার পরমায়ুর কথা না বল, তাহা হইলে আমি গলায় ছুরি দিয়া মরিব, আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।

"ষাট্ ষাট্" বলিয়া ছোট রাণী নীলকমলের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। শেষে ছেলের জেদ এড়াইতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ শিবপূজা করিয়া যে কুয়ার ভিতর ফুলজল ফেলেন, তাহারই মধ্যে এক রাঘব বোয়াল আছে। সেই রাঘব বোয়াল ধরিয়া বড় রাণীর ভাই মদন যদি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া এক-কোপে কাটিতে পারেন, তবে তাহার পেটে সোণার কৌটায় হীরার হার পাইবে। সেই হার তোমার পরমায়ু-হার। যদি তুমি সেই হার গলায় দিতে পার, তবে তুমি অমর হইবে, আর যদি অন্য কেহ গলায় দেয়, তবে সেইক্ষণে তোমার পরমায়ু ফুরাইবে। এ কথা তুমি কাহারও কাছে বলিও না।

আর বলিও না—নীলকমল ছুটিতে ছুটিতে গিয়া বড় রাণীকে সব কথা বলিতে লাগিল। শুনিয়া বড় রাণী আর আহ্লাদে বাঁচে না, সেই দিনেই তাঁর ভাইকে

ডাকিয়া গোপনে সব ঠিক করিলেন। রাত্রিতে রাজা ও নীলকমল পাশাপাশি দুইজনে খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে মুখের গ্রাস হাতে রহিল, সোণার চাঁদ নীলকমল ঢলিয়া পড়িল। রাজা আকুলি ব্যাকুলি করিয়া উঠিলেন; বড় রাণী গলার হীরার হার কাপড়ে ঢাকিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন; খবর পাইয়া ছোট রাণী মূর্চ্ছা গেলেন; রাজ্যে হাহাকার উঠিল।

ছোট রাণী চেতনা পাইয়া রাজার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার নীলকমলের দেহ নষ্ট করিও না; নীলকমল বিধাতার বরপুত্র।"

রাজপুরী থেকে খানিক দূরে, ফুলবাগানের ভিতর খাসা বাড়ী; বাঁধা সরোবর, চারি দিকে ফুল ফুটিয়া আলো করিয়াছে; সেই বাড়ীর ভিতরে সোণার খাটে নীলকমলকে শোয়াইয়া রাখিলেন। ছোট রাণী সেখানে সোণার থালে রাজভোগ সাজাইয়া রাখিয়া যান। রাজা রোজ বিকালে আসিয়া নীলকমলকে দেখিয়া যান। রাত্রে বড় রাণী হীরার হার খুলিয়া বাক্সে রাখিয়া ঘুমাইতে যান, তখন নীলকমল বাঁচিয়া উঠিয়া শিবপূজা করে, রাজভোগ খায়, আবার সকালে যখন বড় রাণী হার গলায় দেন, তখন নীলকমল মরিয়া থাকে, এ কথা কেহই জানে না।

আর এক দেশের রাজা। সে রাজা সর্ব্বদা রাজকাজে ব্যস্ত থাকেন, অন্তঃপুরে আসেন না। একদিন রাত্রিতে রাজা খাইতে আসিয়াছেন, এক পরমসুন্দরী কন্যা রাজাকে সোণার থালে করিয়া ভাত দিলেন। দেখিয়া রাজা রাণীকে ডাকিলেন। রাণী আসিলে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, রাণি! পরের বউ ঝিকে দিয়া আমাকে ভাত দেওয়াইলে কেন?

রাণী জিভ্ কাটিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন,—"তোমার হইল কি? তুমি আপনার সন্তানকেও চেন না? ও যে তোমার মেয়ে!"

রাজা ভাত ফেলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কি! আমার এত বড় মেয়ে আইবুড় রহিয়াছে, এই রাত্রি পোহাইলে কল্য প্রাতে আমি যাহার মুখ দেখিব, তাহারই সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিব। মেয়ের বিবাহ না দিয়া আর অন্নজল খাইব না।"

রাজার রাগ দেখিয়া রাণী থর থর কাঁপিতে লাগিলেন।　　(ক্রমশঃ)

---

## কোথায় সে জন।

আমার পিতামহদেব আদর্শ পুরুষ ছিলেন। আমার পিতৃদেব তাঁহার উপযুক্ত পুত্র। আমাদের গৃহে সদাব্রত দিবার প্রথা আজিও চলিয়া আসিতেছে। পিতৃদেবের কর্ম্মস্থানে দুই চারি জন সাধু-সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই ধুনি জ্বালাইয়া থাকিত।

আমি দুষ্টামীতে সিদ্ধ ছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাদের ধুনির নিকট বসিয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতাম।

সকলকেই "ইহা দাও, উহা দাও,—ইহা খাইব, উহা খাইব,—ইহা লইব, উহা লইব," এইরূপ কথা বলিতে শুনিতাম। কাহারও আটা, ঘৃত, চাউল, কাঠ, কাপড়,—কাহারও বা গাড়িভাড়া, কম্বল, কমণ্ডলু ইত্যাদি প্রয়োজন হইত। কেহ কেহ গাঁজার পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন।

এই সকল ঘটনা, অভাব ও বিষয়ের মধ্যে,—ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ও প্রকৃতির মানুষের ভিতরে,—নানা দেশের ও সম্প্রদায়ের লোকের ভিতরে, একটা বিষয়ের মিল দেখিতাম। সেটা হচ্চে এই যে, সকলেই বলিতেন যে, তিনি কোন না কোন তীর্থের যাত্রী, উদ্দেশ্য, দর্শন! কিসের দর্শন? ঈশ্বরের।

যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতাম, আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও বলেন নাই যে, ঈশ্বরকে দেখা যায়?

আচ্ছা! যদি দেখাই না যায়, তবে "দর্শন, দর্শন" করিয়া, এত কষ্ট-যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া, দেশে দেশে, গাছতলায়, গাছতলায়, রৌদ্রে, জলে, অনাহারে, কষ্টে ভ্রমণ কর কেন?

ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিতেন, নানা দেশ দেখা হয়,—সাধু-শান্তের সহবাস লাভ হয়।

বস্তুতঃ একশত জনকে জিজ্ঞাসা করিলেও একজনও বলিতেন না যে, ঈশ্বরকে তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু সকলেরই মুখে একই কথা,—"দর্শনকা ওয়াস্তে।"

তাই, আমার মনে হইত যে, "কেহই যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন পান না, তখন বোধ হয়, বসিয়াই পাওয়া যায়।"

আরও মনে হইত, "যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিরে না যাওয়া যায়, তবে কি তিনি আমাদের ভিতরেই আছেন না কি?"

"কিন্তু যদি থাকেন, তবে কোথায়? কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখা যায়!"

ছেলেবেলাতে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চড়ুই পক্ষী ধরিতে বড়ই ভালবাসিতাম। তাই মনে হইত, এই রকম সকল দরজা বন্ধ করিয়া, ঈশ্বরের পেছনে তাড়া করিলেই বুঝি পাওয়া যায়। কি করে করিতে হয় ও ধরিতে হয়, তা জানিতাম না।

ছেলেবেলায় দেখিতাম, পিতৃদেব ও দাদারা মধ্যে মধ্যে চাবির 'থোলো' (Bunch) হারাইয়া নানা স্থানে, অতি ব্যস্ত ও ব্যগ্রভাবে, তাহার তল্লাস করিতেন। অনেক সময়ে দেখিতাম, সেই হারান চাবি তাঁহাদের 'কোঁচড়েই' রহিয়াছে। ছেলেমানুষী মনে ভাবিতাম, এমনই করিয়া, নিজের মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া, মানুষ সর্ব্বদাই এদেশ ওদেশ,—এ বিষয়, সে বিষয়,—এ লোক সে লোককে ধরিয়া বেড়ায়,—তাই তাহারা তাঁহার তল্লাস পায় না।

আমার পিতৃদেবের গৃহে যে সমুদায়

সাধু ভক্ত আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল বাঙ্গালী বাউলাদির মুখে দেহ-তত্ত্বের গান শুনিতাম। পিতামহ ও পিতৃদেব সুগায়ক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। গান ও জ্ঞান উভয়ের আদরের সঙ্গে গভীর ভক্তিও ছিল। ভক্ত বৈষ্ণবকুলে জন্মই ইহার কারণ। সেই সকল ভক্তি ও জ্ঞানের মিশ্রণের ভিতর দিয়া, ইসারার মত এক একটা কথা, মাঝে মাঝে আমার মরমের ভিতর প্রবেশ করিত। সে কথা—দেহতত্ত্ব।

অনেক বৎসর পরে, কলেজে "দর্শন" শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সম্মানের (Honours) পাঠ্য পড়িতে পড়িতে দেখি যে, মনোবিজ্ঞান উত্তমরূপ পড়িতে ও বুঝিতে হইলে, সেই আউল বাউল, ভক্ত সাধকগণের "দেহতত্ত্ব" পড়িতে হয়। দেহতত্ত্ব (Physiology) না পড়িলে দর্শনশাস্ত্র উত্তমরূপে বুঝা যায় না।

এতদিনে বুঝিতেছি যে "দর্শন" শাস্ত্র যা ভাবে ও ভাবায়,—সাধু শাস্ত্রগণের "দর্শন"ও তজ্জন্য প্রায় একই বিষয়ে উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত। দেশে দেশে ভ্রমণ ও চিন্তায় চিন্তায় ভ্রমণের উদ্দেশ্য এক,—দর্শন।

নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের-হেট্-কোট্-বুট্-জড়িত অধ্যাপকগণের দেহতত্ত্ব ও ডোর-কৌপীনবস্ত্র আউল বাউল বা ভস্মাচ্ছাদিত সাধু-শাস্ত্রের "দর্শন" ও "দেহতত্ত্ব" একই। এই যে ছাইভস্ম মাখিয়া, শ্মশানে মশানে যোগধ্যানে, শবাসনে, ভ্রমণ কিসের জন্য? এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে যে প্রশ্নটী রহিয়াছে, তাহার উত্তর পাইবার জন্য।

এই পথ কে দেখাইল? যোগেশ্বর শাক্যসিংহ

ইতিহাসে এমন সন্ন্যাসী আর দুটী নাই।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ করিয়া, বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত ও নাশ করিয়া, যে তন্ত্রাদিতে মহাদেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার দেহের ছাইভস্মগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেখিতে পারিলে বুঝা যায় যে, ছাইভস্মের ভিতরের আদর্শ পুরুষোত্তম শাক্যসিংহ।

সেই শাক্যসিংহের শিষ্যগণ দেহতত্ত্ব ও রসায়নশাস্ত্র বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। কেবল রসায়নশাস্ত্র কেন, সর্ব্বশাস্ত্রই যথেষ্ট-ভাবে এককালে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস নামক ইংরাজি গ্রন্থের প্রথম অংশে, ২৪ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত-তন্ত্র পরিবর্দ্ধিত ও নূতন আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়'-প্রণেতা বাগ্‌ভটও বৌদ্ধ ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

# পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। দন্তরোগ—বৃহতীর মূল ও নীলকণ্ঠের মূল একত্র বাটিয়া দন্তমূলে লাগাইলে ব্যথা নিবারণ হয়।

২। নাগেশ্বরের মূল ও আদা একত্র করিয়া দন্ত মর্দ্দন করিলে দাঁতের ব্যথা ভাল হয়।

৩। বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় ব্যথাস্থানে রাখিলে ব্যথা দূর হইবে এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হইবে।

৪। পাপড়ী খয়ের, তাহার সিকি ভাগ কর্পূর-জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দন্ত মর্দ্দন করিলে দন্তবেদনা ও ঘা সদ্য আরাম হয়।

৫। তালমাখনার কাথ কাঁচা দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া কুলি করিলে রক্ত পড়া নিবারণ হয়।

৬। খয়ের ১ তোলা, চূণ।০ আনা, তুতিয়া।০ আনা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৷৷০ আধ সের কিম্বা /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া কুলি করিলে তখনই দন্তশূল নিবারণ হইবে।

---

# নূতন সংবাদ।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

(১) বর্দ্ধমানের মহারাজা, (২) কাশিমবাজারের মহারাজা, (৩) মহারাজকুমার হৃষীকেশ লাহা, (৪) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, (৫) মিঃ দীপনারায়ণ সিংহ। (৬) শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায়। (৭) শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সহায়। (৮) মিঃ কে, বি, দত্ত।

২। যুক্ত-প্রদেশে তুলা—এ বৎসর যুক্তপ্রদেশে ৩৭৯০০০ গাঁইট কার্পাস জন্মিবে। প্রত্যেক গাঁইটে ৫ মণ করিয়া কার্পাস থাকিবে।

৩। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্‌ডের মৃত্যু হইয়াছে।

৪। ব্যবস্থাপক সভা—আগামী ৪ঠা জানুয়ারি বাঙ্গালার নবগঠিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে।

৫। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৬। শ্রীহট্টে বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ১৭ই হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত শিল্প প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকিবে।

৭। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী গত ১৩ই অগ্রহায়ণ সোমবার নরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন।

৮। সম্প্রতি নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পঞ্চম পুত্র জেনারেল কৃষ্ণ সামসের জঙ্গের সহিত নেপালের মহারাজাধিরাজের তৃতীয় কন্যার শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৯। অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় আর এ জগতে নাই। তিনি অনাথ দরিদ্রদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ১০ই অগ্রহায়ণ অমরধামে গমন করিয়াছেন।

১০। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রে কলিকাতা সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

---

# বামারচনা।

## ঈশ্বর-স্তোত্র।

শ্রীচরণে দাও স্থান ওহে দয়াময়।
মন প্রাণ সমর্পণ করেছি তোমায়॥
তিমিরজালেতে ঢাকা হৃদয়-আকাশ।
সদয় হইয়া তাহে হও হে প্রকাশ॥
রোপিত ক'রেছি মনে বাসনা অপার।
জপিব তোমার নাম হৃদে অনিবার॥
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে সদাই থাকিয়া।
শিতিকণ্ঠ-সম প্রেমে নাচিব হেরিয়া॥
নীরাজনা করিব হে অন্তরে তোমায়।
দেখিবে সকলে, প্রেমে কিবা সিক্ত হয়॥
বিস্মৃত হইয়া কভু থেকোনা হে মোরে।
সাধুনর এই ভিক্ষা অধম হে করে॥
কিবা রাজ্য, কিবা ধন, নাহি চাহি আর।
মনেতে সদাই জাগ মাগি এই বর॥
রুদ্ধ করি হৃদ্‌দ্বার রাখিব তথায়।
দ্রবিবে হরবনীরে এ মম হৃদয়॥
পূরিবে মানস মোর পেয়ে তোমাধনে।
রব না গো হ'য়ে রুদ্ধ সংসার-বন্ধনে॥

---

## পুষ্পাঞ্জলি।

১

কত কষ্ট পেলে মা গো! আমার কারণ,
দশ মাস জঠরেতে করিয়া ধারণ;
প্রসবের যে যাতনা,
কে জানে প্রসূতি বিনা,
অবহেলে সহিলে মা প্রসববেদনা,
তব স্নেহে আজো দেহে রয়েছে জীবন।

২

অক্ষম অজ্ঞান ভাবে যবে জড়বৎ
ভূমিষ্ঠ হইনু আমি হেরিতে জগৎ,
আপন যন্ত্রণা ভুলে,
নিলে মোরে কোলে তুলে,
পিয়াইলে তব হৃদি অমৃত-ধারায়,
তব সম স্নেহ মাতা কে ধরে ধরায়?

৩

সহিয়াছ কত কষ্ট সূতিকার ঘরে,
করিয়াছ কটু পথ্য দেহ সুস্থ তরে,
ছিন্ন শয্যা বিছাইয়ে,
নীচজাতি ধাত্রী লয়ে,

একত্রে তাহার সনে করেছ শয়ন,
অগ্নিতাপে সারা নিশা করি জাগরণ।

৪

অসীম স্নেহেতে মাতা করেছ পালন,
শৈশবেতে অসহায় ছিলাম যখন,
সর্ব্বদা প্রহরী মত
রক্ষিতে আমারে মাতঃ!
রোদনে বেদন বুঝি করিতে সান্ত্বনা,
আপনি সহিয়া কষ্ট নাশিতে যাতনা।

৫

মুছায়েছ মলমূত্র তুমি অবিকারে,
করেছ শুশ্রূষা রোগে অশেষ প্রকারে,
আমার আরোগ্য তরে,
ডাক সদা বিধাতারে,
অনিষ্ট-আশঙ্কা করি থাক সশঙ্কিতে,
নিঃস্বার্থ মমতা মাতা, হেরি গো তোমাতে।

৬

হাঁটিবার কালে যদি পড়িতাম ভূমি,
লাগে নাই বলে কোলে তুলে নিতে তুমি,
কহিতে শিখালে কথা,
জ্ঞান বুদ্ধি দিলে মাতা!
করিয়াছ স্নেহগুণে স্বভাব গঠন,
জননি! তোমার সম কে আছে আপন?

৭

জ্ঞানোদয়ে শিক্ষা তরে দিলে বিদ্যালয়ে,
পুত্র-কন্যা অভেদে মা পালিলে সদয়ে,
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে
সাজায়েছ মা! আমারে,
সকল অভাব মাতা! করেছ মোচন,
জননি! তোমার সম কে বুঝে বেদন?

৮

কতই ভেবেছ মোর বিবাহের তরে,
কেমনে পড়িব আমি সুপাত্রের করে,
বহু অন্বেষণ করে,
সমর্পিলে যোগ্য ঘরে,
করেছ যথেষ্ট ব্যয় বিবাহ কারণ,
মোরে সুখী করিতে বা কতই যতন!

৯

তব কোল ছাড়ি এবে সংসারে প্রবেশি,
ভীষণ সংসার-তাপে জ্বলি দিবানিশি,
নিরাপদে তব কোলে,
ছিলাম মা কুতূহলে,
ছিল নাক কোনরূপ যাতনা অজ্ঞান;
ইচ্ছা পুন ফিরে যেন পাই বাল্যকাল।

১০

খেলিতে সংসারখেলা পেতে দেছ ঘর,
সে খেলায় মত্ত সদা নাহি অবসর,
কর্ত্তব্য ভুলায়ে রাখে,
না সেবিনু মা! তোমাকে,
অধম অকৃতি আমি তনয়া তোমার,
স্নেহগুণে ক্ষমা কর জননি! আমার।

১১

স্নেহের মূরতি মাতা তব দরশনে
লভি শান্তি,কোন জ্বালা থাকে না মা,মনে;
মনোব্যথা নিঃসঙ্কোচে,
কহি গো তোমার কাছে,
তব সম দুঃখে দুঃখী কে হইবে আর;
শুধিতে নারিনু তব পলকের ধার।

১২

মম সুখ সম্পাদন কষ্টসাধ্য হলে,
কাতরা না হও মাতা, কর অবহেলে;

তব স্নেহ উপমিতে,
নাই কিছু এ জগতে,
তোমার তুলনা তুমি দেখি গো ভুবনে ;
জননি ! শ্রীপদে ভক্তি থাকে যেন মনে।

১৩

কল্পনা-কানন হতে তুলি সযতনে
গাঁথিয়া কবিতামালা কবিতা-প্রসূনে,
ভক্তিরূপ চন্দনেতে,
সকৃতজ্ঞ হৃদয়েতে,
পুষ্পাঞ্জলি দিনু মা গো ! চরণে তোমার ;
প্রণমি চরণে মাতা ! কোটি কোটি বার !

শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

---

## মাতৃহারা শিশু।

প্রাণ কাঁদে হেরি যত শিশু মাতৃহারা,
সোণার বরণ কায়,
ধূলায় ধূসর হায় !
মাতৃস্নেহ-রস বিনে শুষ্ক কলি পারা।
হেরিলে সে কচি মুখ,
দুঃখেতে বিদরে বুক,
ভাবি বিধি নিদারুণ একি তব ধারা ?
শিশুকালে দাও কেন
কি পাপেতে শাস্তি হেন ?
জানে না বোঝে না আহা ! পাপ পুণ্য যারা।
মাতা নাহি বিশ্বে যার,
কেহ আর নাহি তার,
মায়ের সমান নহে পিসি-মাসিমারা।
মায়ের মতন স্নেহ,
করিতে পারেনা কেহ,
বিশেষতঃ শিশুদের সম্বল মাতারা।
চোখে লয়ে অশ্রুভার,
ছুটে যায় কাছে মা'র—
কেহ সে বকিলে হয়ে অভিমানে সারা।
কিন্তু হায় ! সে প্রকার,
করিবে কাছেতে কার !
মাতৃহারা কচি শিশু আহা অভাগারা !
তাদের মায়ের মত,
কে করে যতন তত ?
অব্যয় অব্যক্ত নিত্য মাতৃ স্নেহ-ধারা।
অবশ্য মা-হারা বলি,
অধিক স্নেহেতে গলি,
পালেন সে পিতামহী মাতামহী যাঁরা।
মায়ের অভাব তবু,
ঘোচে না তাদের কভু,
ক্ষণে ক্ষণে খুঁজি মাকে কেঁদে হয় সারা।
মাতৃ-অঙ্কে যবে কয়—
পিতার আদর হয়,
মাতা বিনে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত তাহারা।
তাদের যে দুঃখ আহা !
না ভাবি পিতারা তাহা,
স্বার্থসুখে মত্ত হন লভি পুনঃ দারা।
দ্বিতীয় পত্নীরে লয়ে,
কামনার দাস হয়ে,
তাঁহারি তুষ্টির তরে ব্যস্ত সদা তাঁরা।
ভুলি জ্ঞান, পাপ, পুণ্য,
হন মনুষ্যত্বশূন্য,
আত্মজে করেন তাই পর আপনারা।

সে অপত্য—পর নয় ;
হিন্দুশাস্ত্রে এই কয়—
পিতৃ-আত্মা পুত্ররূপে জন্মে জায়া দ্বারা।
পিতা পুত্র ভেদ নয়,
পিতাকেই দৃষ্ট হয়
ভার্য্যারূপ দর্পণেতে বহুল চেহারা।
মা-হারা শিশুর যত,
জনক বিবেক হত !
হেন ধনে তুচ্ছ করি কেন কষ্টে মারা
পতির দেহান্ত পরে,
আর না উদ্বাহ করে,
পারেন রহিতে যদি হিন্দু-ললনারা।
তোমরা তাঁদের হেন,
রহিতে নারিবে কেন ?
চিত্ত জয় কর যদি সংযমের দ্বারা।
নারী-মোহ পরিহরি,
অপত্যে আপন করি,
পিতার কর্ত্তব্য পালে ঢালি স্নেহ-ধারা।
মা-মরা হয়েছে যেন,
কিন্তু পর হবে কেন ?
পিতা-পুত্র-সম্বন্ধে যে নিত্য বাঁধা তারা।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

---

## ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-আবাহন।

এস হে এস হে ঘরে দ্বিতীয়া সুন্দর !
কেতকী-সৌরভে পূর্ণ অঙ্গ মনোহর।
ধরণী হয়েছে স্নিগ্ধ,
নাহি আর তাপদগ্ধ,
শিশির-সম্পৃক্ত বায়ু বহে ঝর ঝর ॥
সুরভি পরিয়া গলে শেফালির হার।
অপেক্ষিয়া আছে দ্বারে,
লইবে বরণ করে,
পূজিবে চরণ দুটি বর্ষান্তে আবার।
নবীন উৎসবে পুনঃ মাতাও সংসার।
শোক-দুঃখে সুপ্ত যারা,
হবেগো জাগ্রত তারা,
উদিবে সুখের রবি ভেদিয়া আঁধার ;
সুধাবে নয়ননীর সে আলো-মাঝার ॥
প্রীতির দেবতা তুমি, জানে চরাচর ;
বিলাইয়া ভালবাসা,
বিশ্বে দেও নব আশা,
ভগ্ন প্রাণে কর তুমি শক্তির সঞ্চার ;
সঞ্জীবনী সুধা যেন বহে শতধার ॥
নীরবে উৎসব-কথা কহ কাণে কাণে।
গুরু উপদেষ্টা সম,
দূর কর হৃদি-তম,
সুললিত গাথা গাহ উল্লাসিত প্রাণে।
ধর্ম্ম তুমি, সুখ তুমি, সম্পদ স্বরূপ।
তোমার আচার শুদ্ধ,
পবিত্র পরম বুদ্ধ,
স্নেহ-ভক্তি-মান-ধন বিলাতে লোলুপ।
ভাই-বোন-পাশে তুমি চিরকাম্য রূপ।
মিলন মন্দির-তলে সতী সীমন্তিনী।
ধান দূর্ব্বা হাতে লয়ে,
গঙ্গাজলে স্নাত হয়ে,
ললাটে সিন্দুরবিন্দু ঝলকে দামিনী।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

---

২১।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টিনবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 557. January, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ".

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৭ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৬। জানুয়ারী, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাদকনিবারণ-সভা—বিগত ৩০শে ডিসেম্বর লাহোর ফরম্যান ক্রিশ্চান কলেজগৃহে ভারতীয় মাদকনিবারিণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহুসংখ্যক গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত হইয়া মাদকের বিষময় ফল উল্লেখপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। এ সভায় মাদকনিবারণ বিষয়ে বহুতর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা ফলে পরিণত হউক, ইহাই মঙ্গলময়ের চরণে একান্ত প্রার্থনা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, সর্ব্ব শাস্ত্রেই সুরা অস্পৃশ্য, কিন্তু ধর্ম্মানুশাসন কয় জন মানিয়া চলে?

লাহোরে মহিলা-সভা—বিগত ৩০শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, লাহোর ইউনিভার্সিটি হলে এই সভার অধিবেশনে প্রায় ৪০০ চারি শত মহিলার আগমন হয়। এই সভায় শ্রীমতী সরলা দেবী মহিলাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্যবিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় শিল্পসমিতি—বিগত ৩০শে ডিসেম্বর লাহোরে ভারতীয় শিল্প সমিতির বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বারবঙ্গের মহারাজ ইহার সভাপতি। সভায় পঞ্জাবের ছোট লাট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ এবং নানাস্থানের মান্যগণ্য মহাত্মারা উপস্থিত হইয়া ভারতে কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতিকল্পে নানা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সাধনার অসাধ্য কি আছে? সদনুষ্ঠানে সকলের যথায় সমবেত, অবিচ্ছিন্ন ও একান্ত সাধনা, তথায় ঈশ্বর কৃপাদৃষ্টি দিবেনই। "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।"

আমাদের অসীম শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মানের পাত্র মহাত্মা কে, জি, গুপ্ত মহোদয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত। ইনি নিজ অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা-প্রভাবে

যে পদ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ইনি তাহা লাভ করিয়া এবং সে পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আমাদের সর্ব্বসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।" ইঁহাদের বংশ বড় উচ্চ। ইঁহার ৺ পিতৃদেব নির্ব্বিকারতায়, অমায়িকতায় ও ব্রহ্মনিষ্ঠায় দ্বিতীয় শুকদেব ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সোদর ৺ স্বর্গীয় গঙ্গাগোবিন্দের শিশুসুলভ সরলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, নয়ন ও কণ্ঠ বাষ্পভরে প্লাবিত হয়; হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি অকালে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে কে, জি, গুপ্ত মহাশয়কে নিরাময় ও চিরজীবী দেখিলে সে শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইব। দয়াময় বিশ্বনাথ ভারতের অমূল্য মহারত্ন কে, জি, গুপ্ত মহোদয়কে অশেষ লোক-কল্যাণ জন্য রক্ষা করুন।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ চন্দ্র সমসেয়ার জঙ্ রাণা বাহাদুর মহোদয় ছয় সহস্রেরও অধিক সুদুর্ল্লভ, অপ্রকাশিত সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিতে চাহিয়াছেন। ঐ সকল অনর্ঘ্য গ্রন্থরত্নরাজি নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড লাইব্রেরি হইতে লইয়া অক্সফোর্ডে প্রেরিত হইবে। এ সংবাদ সত্য হইলে, বড়ই পরিতাপের বিষয়! এরূপে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন সকল এদেশে অদৃশ্য হইতে লাগিল। এরূপ না করিয়া, স্বদেশে ঐ সকলের সংরক্ষণ, মুদ্রাঙ্কন ও প্রচারাদি একান্ত কর্ত্তব্য। এ অনির্ব্বচনীয় সৎকার্য্যে নেপালরাজ অবশ্যই ধনবলে বা লোকবলে কিছুতেই অক্ষম নহেন। ঐ পুস্তকগুলি অন্ততঃ অত্রত্য আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকভাণ্ডারে রক্ষিত হওয়া উচিত। অত্রত্য স্বনামধন্য ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগণ্য ও অমূল্য গ্রন্থরত্নরাশির অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহণে সে সকল গ্রন্থরত্নের কি দশা হইল! হাই-কোর্টের মহামান্য জষ্টিস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও দুর্ল্লভ গ্রন্থসমূহের অধীশ্বর। আশা করি, তিনি সময় থাকিতেই ঐ সকল গ্রন্থরত্নের স্বদেশেই সংরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না। ঈশ্বরকৃপায় এক্ষণে কলিকাতায় স্বদেশহিতৈষিগণের যত্নে জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা বহুল দুর্ল্লভ পুস্তকের অধিকারী, তাঁহারা যদি অতঃপর পরলোকগমনকালে স্ব স্ব গ্রন্থরাশি এই জাতীয় বিদ্যালয়ের গ্রন্থভাণ্ডারে দান করেন, স্বদেশের গৌরব কত বর্দ্ধিত হয়!

---